আচমকা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম
সংস্করণ :
৭ই ভাদ্র, ১৩৬১

দুই টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

সুলেখিকা সুলেখা দাশগুপ্তা

কল্যাণীয়াসু—

কাহিনীটি প্রথম রচিত চিত্রনাট্যের আঙ্গিকে। তার কাঠামোয় বর্ণনা ও অন্তর্নিরীক্ষার মেদ চাপিয়ে নধরদেহী একটি বড় গল্প, বা ঢিলে কথায় আমাদের সাহিত্যে যাকে উপন্যাস বলা হয়, তাতে রূপান্তরিত করা না যেতো—এমন নয়। কিন্তু সে চেষ্টা করিনি। কারণ, কাঠামো চাপাতে গেলে, মজাও খানিকটা চাপা পড়বে বলেই আমার বিশ্বাস। ঘটনাপ্রবাহে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সংলাপ থেকেই, তাই সংলাপের প্রাধান্যও অক্ষুণ্ণ রেখেই এগিয়েছি। চিত্রনাট্যে যা আছে, তার কোনো অংশ বা সংলাপ রূপান্তরের দাবীতে বাতিল করতে হয়নি। চিত্রে অধিকন্তু বড় ব্যতিক্রম যদি কিছু পান তো, তার গুণাগুণের দায়িত্ব চিত্রনাট্যকার হিসেবেও আমি গ্রহণ করছি না। এ প্রসঙ্গে এটুকুও বলে রাখি, এই কাহিনী-রচনায় আমার প্রধান প্রয়াস ছিলো, 'কমিক এ্যাক্টিং-সিচ্যুয়েশন-ডায়ালগ' ছাড়া সহজ ঘটনাপ্রবাহে হাস্যরসের অবতারণা করা। বিশেষ এক সমস্যার সমাধানে, প্রচলিত প্রয়াসের ব্যতিক্রম থেকে এ কাহিনীর উদ্ভব—পরবর্তী প্রতিটি ঘটনা স্বাভাবিক অনিবার্যতায় সহজ পদক্ষেপেই এগিয়ে গেছে। যে-কোনো মাধ্যমেই হোক, হাসানোর কোনো স্পষ্ট প্রয়াস শুধু বাহুল্যই হবে তা নয়, কাহিনীর চারিত্রিক স্খলনের কারণ হবে বলেই মনে করি। তা ছাড়া তাতে করে খানিকটা সামঞ্জস্য নষ্ট হবারও সম্ভাবনা থাকবে—যদিও তা আপাতঃ রস গ্রহণে ব্যাঘাত না-ও ঘটাতে পারে।

গ্রন্থ ও চিত্র, উভয় মাধ্যমের জন্যেই এ গল্পের নামকরণ করেছিলাম 'আচমকা'। চিত্রজগতে সবকিছুকেই সর্বজন-সমাদৃত করার আগ্রহাতিশয্য প্রায়শঃই নানা ক্ষেত্রে মনস্থির করার পথে বিভ্রান্তি ঘটায়। সেই বিভ্রান্তির বাধা কাটিয়ে শেষপর্যন্ত নাম সেখানে স্থির হলো 'ছেলে কার'—গ্রন্থের ললাটিকা কিন্তু 'আচমকা'ই রইলো।

এ গ্রন্থ ও চিত্রনাট্যের শ্রুতিলিখনে শ্রীমতী বিনতা রায়ের উৎসাহ ও সানন্দ সহযোগিতা ধন্যবাদের মুখাপেক্ষী না হলেও, তার উল্লেখের অভাবে বক্তব্য হতো অসম্পূর্ণ।

৭ই ভাদ্র, ১৩৬১ — জ্যো. রা.

ক ল কা তা

ছেলে কার! আপনি জানেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি খবর কম রাখেন এমন তো নয়। সকালে উঠে গরম চায়ের সঙ্গে দৈনিক কাগজের পাত বিছিয়ে গোটা দুনিয়ার গরম খবরগুলো সাগ্রহে উদরস্থ করেছেন সন্দেহ নেই—কিন্তু আপনার পাশের বাড়ীর খবর? আপনাকে প্রশ্ন করে কি হবে, আমরাই কি ছাই সে খোঁজ রাখি! কিন্তু যোগেনের বড় বালাই, সে খবরের কাগজ পড়ে না, তাই জ্ঞানও তার কম। কিন্তু তার ঘরের পাশের খবরটুকু সে রাখে, ফলে আমাদের চেয়ে দায়িত্ব তার বেশী—তাইতো ছেলেটার পরিচয় আর কেউ না জানুক, জানে ঐ যোগেন। জানার বিপদও তারই, ঘাড়ে নিয়ে ফিরতে হচ্ছে তাকে। কিন্তু ঘাড়ের হাড়গুলো পচা মাচার মতো মড়মড় করে উঠলো, দরদী মাচার ভার নিয়ে ভাবনা একটু হয় বৈকি—এ্যাদ্দিন যাকে ধরে রেখেছে তাকে এখন নাবায় কোথায়!

যোগেন বুঝেছে চরম ডাক তার এসেছে। মনে মনে হাসে সে। সত্যি গভীর পরিহাস বোঝার সূক্ষ্ম বোধটুকু আছে তার। মানুষের হাতে গড়া ভাগ্যচক্রের যে-কুটিল পরিহাসের চাপে

চেপ্টে যাচ্ছে অসংখ্য জীবন, তাকে চিনতে পেরে হেসে ওঠা কম কথা নয়! ভাগ্যদেবীর কোল জুড়ে গুটিকয় তার সস্নেহ-লালিত সন্তান—তার বাইরে আর সবাইকে পাদপীঠ করে ছু-পা বাড়িয়ে সুড়সুড়ি কাটছেন তিনি সবার পিঠে। দেবীর সুড়সুড়ি মানবের পিঠে অসহ্য—যোগেন ভাবে যাবার আগে জবাব এর একটা দিয়ে যেতে হবে।

এর পর নিশ্চয়ই, জানতে চাইবেন, যোগেন কে ?

যোগেনকে তার অঞ্চলে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছু-চারখানা বস্তির লোক যোগেনমাস্টার বলেই জানে। খোলার বস্তির গা ঘেঁষে একতলা একটা পুরোনো বাড়ী, তারই একটা ঘরে থাকে সে। বাড়ীটা পাকা হলেও বর্তমান অবস্থা এমনি যে, বস্তির গা ঘেঁষে অবস্থান তার নিজের মর্যাদা যেমন কমায়নি, তেমনি বাড়ায়নি বস্তির গৌরব—বেশ এক হয়েই মিশে গেছে পরিবেশের সঙ্গে। সেই একতলারই একটা ঘরে থাকে যোগেন। তার ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা নড়বড়ে তক্তপোশ, দেয়ালের গা ঘেঁষে কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপর মরচেধরা তোবড়ানো একটা ট্রাঙ্ক, আর ঘরের ঠিক মাঝখানে একখানা লোহার তারের চেয়ার। বয়স কিংবা বস্তুর চাপে চেয়ারের চারটে পা-ই ছড়িয়ে গিয়ে অনেকটা অসমান হয়ে গেছে—তারই ওপর বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছ-সাত বছরের একটি ছেলে। পাশেই তক্তপোশে বিছানো শতছিন্ন নোংরা বিছানাটায় বসে

ছেলেটির দিকে ঝুঁকে আছে যোগেন। তাকে দেখলেই বোঝা যায় ফুসফুসের কোন দুরারোগ্য রোগে ভুগছে সে। অনেকদিন কামানো হয়নি বলে মুখটা ছেয়ে আছে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে। রোগের চাপে বেঁকে-যাওয়া শরীরের ডগায় অপরিচ্ছন্ন সেই মুখে চকচক করছে আনন্দোজ্জ্বল একজোড়া চোখ। সে-চোখের সঙ্গে আশপাশের কোনো কিছুরই মিল নেই—তার দৃষ্টি যেন জীবন ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে পরিহাস করছে।

ক্রন্দনরত ছেলেটির নাম টোম্যাটো। যোগেন টোম্যাটোর সঙ্গে এতক্ষণ যত কথা বলেছে তারই ধাক্কা সামলাতে সে একটু দম নিচ্ছিলো। উদ্গত কাসি সশব্দে মুক্ত করে দিয়ে বার দুই হাঁপায়, চোখের দৃষ্টিও একটু স্তিমিত হয়ে আসে—কিন্তু মুহূর্ত মাত্র, আবার সোজা হয়ে বসলো যোগেন; চোখ তার হয়ে উঠলো উজ্জ্বল। টোম্যাটোর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সস্নেহ শাসনের সুরে বলে উঠলো সে, 'ব্যস্, কান্না সুরু হলো, কান্না থামা—থামা—'

টোম্যাটো কান্না চাপতে চাপতে চোখ তুলে তাকালো যোগেনের দিকে।

'হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন চোখ মোছ—'

কলের পুতুলের মতো যোগেনের নির্দেশ অনুযায়ী দু-হাতে রগড়ে চোখ মুছতে সুরু করে টোম্যাটো।

'বাঃ, এই তো চাই—' উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো যোগেন।

'আরে বোকা, এই ছোট্টটি থেকে', হাত দিয়ে পরিমাপটা দেখিয়ে দিল সে, 'নিজের হাতে পেলে তোকে এতবড়টি করেছি, তোকে চিরদিনের মতো ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হয় না? কিন্তু কষ্ট হলেই আমাদের কাঁদতে নেই—কষ্ট হলেই যদি কাঁদি তো আমরা হাসবো কখন? বুঝলি আমার কথা—কি বললাম?'

না-বোঝার ভঙ্গীতে মাথা নাড়লো টোম্যাটো।

'বুঝিসনি—তা বেশ, মনে রাখিস। তোর স্মরণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ আছে, কথাগুলো তোর মনে থাকবে জানি, একদিন বুঝবি—' হঠাৎ কথার মোড় ফেরালো যোগেন, 'বল তো টোম্যাটো, আমি তোর কে?'

'মামা।' চাপা কান্না মেশানো নাকি-সুরে উত্তর দিলো টোম্যাটো।

'হ্যাঁ, লোকেও তাই জানে—' বলতে বলতে জোর একটা দম নিয়ে উঠে দাঁড়ালো যোগেন। পায়চারি করতে করতে অনেকটা আপন মনে, কিছুটা বা টোম্যাটোর কানে তুলে দেওয়ার মতো করে বলতে লাগলো সে, 'কিন্তু বুঝিস না-বুঝিস জেনে রাখ টোম্যাটো, আমি তোর কেউ নই—আমাকে যে-রোগে ধরেছে, সে রোগে প্রথম গেল তোর বাবা, তারপর মা—মরা মায়ের পাশে তুই বসে কাঁদছিস, দুই বছরের শিশু—তুলে নিয়ে এলাম। দিনের পর দিন কাটলো, তোকে আপনার বলে দাবী করতে কেউ এলো না—সেই থেকেই তুই আমার ভাগনে। ফুটফুটে

গোলগাল চেহারা দেখে নাম রাখলাম টোম্যাটো—' বার দুই কাসলো যোগেন। তারপর ফিরে এসে বসলো টোম্যাটোর মুখোমুখি। 'আবার সে রোগ তোর পেছু নিয়েছে টোম্যাটো। এ থেকে দূরে তোকে সরাতেই হবে—বাঁচিয়েছি বলে তোকে মারবার অধিকার আমার নেই—' চোখদুটো চকচক করে উঠলো যোগেনের। বললো, 'তাই না মাথা খেলিয়ে এমন বুদ্ধি বার করেছি—' এবার পাগলের মতো হেসে উঠলো যোগেন। 'ভাগ্য আমাদের নিয়ে এতো পরিহাস করছে, দেখিনা তার একটা পাল্‌টা জবাব দিয়ে—লাগে ভালো, না লাগে তো এর চেয়ে মন্দ আর কি হবে—' ভেতরের উত্তেজনা ও উদ্বেগ যথাসম্ভব সামলে নিতে একটু সময় লাগলো যোগেনের। তারপর ধীর শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি যা বুঝিয়ে দিয়েছি সব মনে আছে?'

'আছে।' ঘাড় তুলে দৃপ্ত ভঙ্গীতে জবাব দিলো টোম্যাটো।

সোৎসাহে টোম্যাটোর পিঠ চাপড়ালো যোগেন। 'বাঃ বাঃ! এইতো আমার টোম্যাটো—এখন হাসো তো, হাসো—'

জোর করে একটু হাসলো টোম্যাটো।

'বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও।'

বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো টোম্যাটো।

'বাঃ, এই তো আমার হাতে তৈরী ছেলে! শোন টোম্যাটো, তোকে কোনোদিন কেউ আমাকে দেয়নি, আমিও কাউকে দিয়ে যাবো না—দাঁড়া এখন তোকে সাজাই। তোর জন্মে

কি চমৎকার পোশাক এনেছি ছ্যাখ—' বলে এগিয়ে গিয়ে তোবড়ানো ট্রাঙ্কটা খুলে বার করে আনলো নতুন কেনা জামা-জুতো। নিজের মুখে-চোখে খুশীর ভাব ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'কি, কেমন জামা কেমন সুন্দর জুতো—পছন্দ হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ।' তেমন কোনো উৎসাহের ভাব দেখা গেল না টোম্যাটোর মুখে।

'এই তো, তোর মনটা এখনও খারাপ। এই জামাজুতো দেখে তুই যে লাফিয়ে উঠলিনে! খুশী হ'—নয়তো পরাবো না।'

চেষ্টাকৃত উৎসাহের সঙ্গে হাততালি দিয়ে বললো টোম্যাটো, 'চমৎকার, খুব সুন্দর !'

'ব্যস্, দাঁড়াও পরিয়ে দিচ্ছি।' টোম্যাটোর গায়ের ময়লা ছেঁড়া শার্ট আর হাফপ্যাণ্ট খুলে নিয়ে, পাটভাঙা খাসা একটা ফুলপ্যাণ্ট আর হাওয়াই কোট পরিয়ে দিলো যোগেন। চিরুনী এনে সযত্নে চুলটা আঁচড়ে দিয়ে বললো, 'দাঁড়া, আরও আছে—' একটা কাগজের পুঁটলি থেকে বার করলো খানিকটা পাউডার। পাউডারটুকু টোম্যাটোর মুখে মাখিয়ে দিয়ে দু-হাতে তুলে ধরে বসিয়ে দিলো চেয়ারে। তারপর একটু সরে দাঁড়িয়ে, ঘাড় কাত করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে বললো, 'বাঃ, একেবারে রাজপুত্তুরের মতো দেখাচ্ছে রে, কে বলবে তুই যোগেন মাস্টারের ভাগনে—' এবার হাঁটু গেড়ে বসে নতুন জুতো-জোড়া পরিয়ে দিলো যোগেন, তারপর উঠে গিয়ে পেরেকে লটকানো নিজের জামাটা গায়ে

চড়িয়ে ফিরে এলো টোম্যাটোর সামনে। কথাগুলোর ওপর বেশ একটু জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আঁকড়ে থাকার কথাটা মনে আছে ?'

'আছে।'

'কেবলই কি বলতে হবে মনে আছে ?'

'আছে—'

'আচ্ছা, এসো এখন পাশে দাঁড়াও।'

কথামতো পাশে এসে দাঁড়ালো টোম্যাটো। এতক্ষণে বেশ একটু ক্লান্তই বোধ করছিলো যোগেন, সজোরে সেটা ঝেড়ে মহা একটা উৎসাহ নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো সে। মিলিটারী কেতায় বলে উঠলো 'এ্যাটেন্‌শন—'

তারই অনুকরণে সোজা হয়ে দাঁড়ালো টোম্যাটো।

'মার্ক টাইম্‌!'

যোগেন ও টোম্যাটো একসঙ্গে পা তোলে ও নামায়।

'কুইক মার্চ—ফরওয়ার্ড—' সৈনিক-চালে টোম্যাটোকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো যোগেন।

যোগেনের ডেরা লেক থেকে বেশী দূরে নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেলো লেক-এ।

কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের এই কৃত্রিম আধা প্রাকৃতিক দৃশ্যটুকু নাগরিক জীবনের পক্ষে লোভনীয় হবারই কথা। বেলা পড়তেই তাই ভ্রমণবিলাসীর দল এসে ভিড় জমায় এই লেক-এ।

সার-বাঁধা গাড়ী আর ভ্রমণকারীদের ভিড়ে সন্ধ্যায় তো স্থানটি বেশ সরগরমই হয়ে ওঠে।

টোম্যাটোকে নিয়ে যখন লেক-এ পৌঁছলো যোগেন তখনও পশ্চিমের সূর্য লেক-এর জলে ঝকমক করছে। লোকজন আসতে স্থুরু করছে মাত্র। দু-চারখানা গাড়ীও এসে না-দাঁড়িয়েছে এমন নয়। ঘুগনি, গরম মুড়ি ও আইসক্রীম-ওয়ালারা ব্যস্ত হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। টোম্যাটোর হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল যোগেন, এমন সময় বেশ একটা বড় গাড়ী এসে দাঁড়ালো লেক-এর পাড় ঘেঁষে। 'চটপট এগিয়ে আয় টোম্যাটো—দেখা যাক গাড়ীটা'—যোগেন সাগ্রহে পা চালায়।

গাড়ী থেকে নামলো এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর বৃদ্ধা মহিলা। তাঁদের দেখে থেমে পড়লো যোগেন। 'ধেৎ তোর এক জোড়া বুড়োবুড়ি' নিরাশ কণ্ঠে বলে উঠলো যোগেন। 'আয়, চলে আয়।'

সেখান থেকে সরে এসে এ-বেঞ্চ সে-বেঞ্চে দু-একজন করে যারা বসেছিলো তাদের আশপাশ দিয়ে একবার ঘুরে এলো যোগেন। একটু সরে এসে বললো, 'নাঃ, এদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না—আয় চলে আয়, ওখানটায় বসে একটু জিরিয়ে নি।'

রাস্তা পার হয়ে খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ে যোগেন আর টোম্যাটো। সেখানে বসে যোগেন

সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে চলে এদিক-ওদিক। ভিড় বেড়ে চলেছে, দু-একখানা করে গাড়ীও এসে দাঁড়াচ্ছে। যোগেনের নজর কিছুই এড়ায় না। এরই মধ্যে একখানা গাড়ীকে দাঁড়াতে দেখে সে একটু নড়েচড়েও উঠেছিলো। পরমুহূর্তেই কি যেন লক্ষ্য করে যেমন ছিলো তেমনি বসে রইলো। এমনি করে কিছুটা সময় কাটতে-না-কাটতেই তাদের খুব কাছাকাছি লেকের পাড় ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো চকচকে ঝকঝকে একখানা মাঝারি সাইজের 'গাড়ী। গাড়ী দাঁড় করিয়ে স্টিয়ারিং ছেড়ে নেবে আসে সুঠাম সুশ্রী দীর্ঘাকৃতি এক যুবক। বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। পরনে দামী স্যুট, হাতে সিগারেটের টিন। পেছন ঘুরে ঝটকা ঠেলায় ঝপাং করে গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করে কেতাদুরস্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে যায় সে লেকের ধারে।

লোকটিকে লক্ষ্য করে যোগেন সোৎসাহে উঠে দাঁড়ায়। টোম্যাটোর হাত ধরে তুলে চাপা গলায় বলে, 'আর একটু এগোনো যাক।'

এইমাত্র গাড়ী থেকে যে যুবকটি নেমেছে তার নাম কুণাল। কুণাল লেকের ধারে এগিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছিলো, এমন সময় অদূরে একটা বেঞ্চে বসা তারই সমবয়সী যুবক বলে উঠলো, 'এই যে এখানে—'

ডাক শুনে সেদিকে এগিয়ে যায় কুণাল।

রাস্তার উল্টো দিকে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে যুবকটিকে

লক্ষ্য করে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিলো টোম্যাটো আর যোগেন।

'খাসা মক্কেল ছিল রে ? আবার একটা বন্ধু জুটলো—দাঁড়া, দেখি বন্ধুটা খসে পড়ে কিনা।' যোগেন আর টোম্যাটো থামলো। একটু ভেবে নেয় যোগেন। 'শোন টোম্যাটো, তুই ঐ গাছতলাটায় গিয়ে চুপটি করে বোস—' বেশ খানিকটা দূরের একটা গাছ দেখিয়ে দিলো যোগেন। 'আমি ওদের কাছাকাছি ঘুরে লোকটাকে একটু বুঝে আসি।'

টোম্যাটো চলে গেলো যোগেনের নির্দেশ মতো। যোগেন অনুসরণ করলো কুণালকে।

বন্ধুর বেঞ্চির কাছে এগিয়ে এসে প্রথমেই বললো কুণাল, 'এই যে রবীন—রীণা আসেনি ?'

'না, কিছুতেই 'ম্যানেজ' করে আজ বেরোতে পারলো না হোস্টেল থেকে।'

'হুঁ—যাক্, না পেরে ভালোই হয়েছে।'

গম্ভীর মুখে কুণাল বসে পড়ে বন্ধুর পাশে। টিন খুলে একটা সিগারেট রবীনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরায়, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে, 'যতো ঝামেলা—'

কুণালের মুখের ভাব লক্ষ্য করে রবীন। 'হলো কি, মেজাজ এতো খারাপ ?'

'এইমাত্র বেরোবার সময় বাবা 'সীরিয়াসলি' ঘোষণা করেছে, হালচাল না বদলালে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবে। সে না-হয় যা হবার হবে, কিন্তু বর্তমানে মার তহবিলটি পর্যন্ত আটক করে আমার হাতটা যে শ্মশান করে দিলো সেইটাই ভাবনা—আজকাল যা টানবার ওখান থেকেই টানছিলাম কিনা।'

'বাবার আজ বিগড়ানোর নগদ কারণটা কি?'

'এই অণিমার বুড়ো বাপটা এসে সকালে বাবার কাছে কান্নাকাটি করেছে—আমি নাকি ওর মেয়ের পেছনে জুটে তার সর্বনাশ করছি—'

'ভারী অন্যায় কথা বলেছে তো বুড়োটা—' রবীনের মুখে দেখা দিলো অর্থপূর্ণ শ্লেষের হাসি।

রবীনের কথার সুর ও মুখের হাসিটুকু লক্ষ্য করে কুণাল। এ হাসির অর্থ বোঝা কঠিন কিছুও নয়। কুণাল নিজেও জানে, অণিমার বাবার নালিশ জানানোটা কতখানি যুক্তিসঙ্গত। দু-মাস হলো অণিমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কুণালের, এরই মধ্যে তাদের মেলা-মেশা নিয়ে পরিচিত মহলে নানা অপ্রীতিকর আলোচনাই চলছে। চলবেই বা না কেন? মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা সম্পর্কে বেশ একটা সুপুষ্ট অখ্যাতি অর্জন করেছে কুণাল, বছরের পর বছর নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে। যদিও সব দিক বিচার করলে কুণালকে খুব একটা মন্দ লোক বলা চলে, এমনও নয়। সাধারণ সদ্‌গুণ আর অনেকেই আছে। কুমতলব

এঁটে আটঘাট বেঁধে কোনো কিছু করাও তার স্বভাব নয়। তবে কিনা মেয়েদের সম্পর্কে কুণালের মনোযোগটা যেন ইস্টিমারের সার্চলাইটের মতো, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায় না—স্বল্প সময়ে ক্ষেত্র পরিবর্তন করে ছুটোছুটি করে বেড়াতেই ভালোবাসে বেশী। ফলে নানা গোলযোগও ঘটে থাকে। সংখ্যাধিক্যের দিকে নজর রেখে মেলামেশা করতে গিয়েও কাউকে কখনও বা অন্তর থেকেই ভালো লেগে যায়—এমনকি বিবাহ-রূপ একটা মহৎ উদ্দেশ্য আরোপ করেই সেক্ষেত্রে এগোতে থাকে সে, কিন্তু অনিবার্যভাবেই নতুন আর এক হিঁচকে টানে সব উদ্দেশ্য তার গুলিয়ে যায়। কলকাতার অভিজাত সমাজে এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে নালিশেরও যেমন অন্ত নেই, তেমনি আবার নতুন নতুন আগ্রহেরও অভাব দেখা যায় না। আজও অনেক সুন্দরী তরুণীর পিতামাতা কুণালের এই আগ্রহের পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে থাকেন। তাঁরা হয়তো আস্থা রাখেন এরই ওপর যে, তাঁদের মেয়েটিকে কেন্দ্র করেও তো কুণালের এই আপত্তিকর চপলতা স্থির হয়ে আসতে পারে। মূল কথা, কুণাল যে অভিজাত ধনিক সম্প্রদায়ের অন্যতম মানিশ্রেষ্ঠ শিবনাথ সেনের পুত্র, এ কথা পরিণতবয়স্কা আধুনিকা ও তাদের বাপ-মায়েরা ভুলতে পারে না।

অভিজাত সমাজে নারীপুরুষ-ঘটিত সমস্যা নিয়ে নালিশ উঠলেও তা চাপা পড়তে তেমন সময় লাগে না। এদিক থেকে

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সচেতনতার তীব্রতা এখনও তেমন কাটেনি। তাই থেকে থেকে সেই গণ্ডীতে কুণালের অভিযান গুরুতর গোলযোগের সৃষ্টি করে বসে। নালিশ ও কান্নাকাটির ধাক্কায় শিবনাথ হন বিব্রত ও অপমানিত। অণিমার বাবাও আজ বেশ বড় রকমেরই একটা অশান্তির সূচনা করে গেছেন।

রবীন নিজেও ছা-পোষা মধ্যবিত্ত পরিবারের। হয়তো বা তাই অণিমার সঙ্গে কুণালের ঘনিষ্ঠ মেলামেশাটা কখনো সমর্থন করতে পারেনি সে—সুযোগ বুঝে প্রতিবাদ না জানিয়েছে এমনও নয়। আজও তাই শ্লেষের হাসির সঙ্গে ঐ কথা ক'টি বলে একটু চুপ করে থেকে বললো, 'কতবার বলেছি, যা করবার নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই কর—তা আমার কথা তো কানে তুলিস না।'

'বাজে কথা রাখ।' বিরক্তির সঙ্গে থামিয়ে দেয় কুণাল রবীনকে, 'যা বলছি শোন—হাত একদম খালি, কোনো 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' রাখতে পারবো না। আজ স্বপ্নার জন্মদিন, ওকে একটা ঘড়ি প্রেজেন্ট করবো বলেছিলাম, সাতটার আগেই গিয়ে খবর দিবি যে, একটা জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে আমি কলকাতার বাইরে চলে গেছি, ফিরতে দিন কয়েক দেরী হবে। লিলিকে সাড়ে আটটায় 'ফারপোজ'-এ মীট করতে বলেছি, ওকেও গিয়ে এই একই কথা বলবি—আর কাল সকালে নীতাদের বাড়ী গিয়ে—' একটু থামে কুণাল। একটু ভেবে

নিয়ে বলে, 'আচ্ছা থাক, আজকের গুলো তো 'ম্যানেজ' কর, তারপর দেখা যাবে—'

'ম্যানেজ আমি ঠিকই করবো, কিন্তু তোর হাল এমন হলে আমার উপায় হবে কি ?'

'মাথায় নিজের ভাবনাটাই আগে আসে, না ? তোর দরকার চালিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা আমার সব সময়ই থাকবে, এখন যা ভাগ্—যা বললাম করগে।'

উঠে পড়ে রবীন। 'তুই— ?'

'এখন তো এখানেই আছি, তারপর জানি না—দেখি কোনো একটা বুদ্ধি মাথায় আসে কিনা।' রবীন যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ডাকে, 'শোন—' একটু দম ধরে থেকে বলে, 'লতাকে বিয়ে করে ফেলি কি বলিস ?'

'লতা মানে সেই বটগাছের গুঁড়িটি তো—' হাত দিয়ে পরিধিটা দেখিয়ে দেয় রবীন। 'ঐ মুটকিকে তুই বিয়ে করবি ?' সশব্দে হেসে উঠলো সে।

'এক কাঁড়ি টাকা পাওয়া যাবে যে—' রবীনের হাসিতে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না কুণালের মুখে। অবহেলার সঙ্গে বলে, 'চারদিকে এতসব থাকতে বৌ আবার সরু আর মোটা— আচ্ছা তুই যা এখন, ভেবে দেখি—'

হাসতে হাসতেই চলে যায় রবীন।

এ সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলো যোগেন। রবীন চলে

যেতেই ছুটে গেল সে টোম্যাটোর কাছে। 'ওঠ টোম্যাটো, যা— এখন যা—'

টোম্যাটোকে হাতে ধরে টেনে তুললো সে।

টোম্যাটোর মুখ শুকিয়ে যায়, সে এগোতে চায় না। যোগেন আবার সেই সতেজ ভঙ্গীতেই চাপা গলায় বলে ওঠে, 'এ্যাটেন্‌শন—মার্চ—' তার সবটুকু উৎসাহ যেন সঞ্চারিত করতে চায় টোম্যাটোর মধ্যে।

এক-পা দু-পা করে এগিয়ে যেতে থাকে টোম্যাটো। যোগেনের মুখের কষ্টকৃত সব উজ্জ্বলতা স্তিমিত হয়ে আসে। কয়েক মুহূর্ত টোম্যাটোর দিকে সস্নেহ দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে লক্ষ্যহীনভাবে পা চালিয়ে দেয় সে।

কুণাল তার বেঞ্চিতে বসে চিন্তিত মুখে সিগারেট টানছে। আশপাশের লোকজনের চলাফেরা—কোনোদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। ইতিমধ্যে তারই বেঞ্চে যে ছোট একটি ছেলে এসে বসেছে তাও সে লক্ষ্য করেনি। ছেলেটি কিন্তু কুণালের দৃষ্টি টানতে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগলো তার কাছে। যখন একেবারে গিয়ে গা ঘেঁষে বসেছে তখন কুণালের চমক ভাঙলো। তাকিয়ে দেখে, গোলগাল সুন্দর একটি ছেলে। ছেলেটিও তার দিকে তাকালো, চকচকে সুন্দর দুটি চোখ। ছোটো ছেলেমেয়েদের দেয় সাধারণ সস্নেহ ভাব নিয়ে কুণাল পিঠে

হাত রাখলো ছেলেটির। নেহাত মামুলীভাবেই প্রশ্ন করলে, 'তোমার নাম কি খোকা ?'

'টোম্যাটো।' বলে আবদারের ভঙ্গীতে আরেকটু গায়ের সঙ্গে মিশে বসলো ছেলেটি।

কুণাল বেশ একটু কৌতুকই বোধ করলো ছেলেটির এই ঘনিষ্ঠভাব দেখে। হেসে বললো, 'বাঃ, খাসা নতুন নাম তো তোমার ! কার সঙ্গে এসেছো ?'

এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না ছেলেটি।

'কাছেই থাকো বুঝি ?'

এবার মাথা নেড়ে ছেলেটি জানালো, 'হ্যাঁ'।

'অ—আচ্ছা, বোসো—' বলে সিগারেটে টান দিয়ে কুণাল নিজের চিন্তায় মন দেয়।

'তোমার নাম কি ?' কচিকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ছেলেটি।

'আমার নাম !' উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো কুণাল। প্রশ্ন শুনে বড়ই কৌতুক বোধ করলো সে। টেনে টেনে স্পষ্ট করে বললো, 'আমার নাম কুণাল সেন দি গ্রেট—মনে থাকবে তোমার ?'

বলে আবার হাসলো।

'হুঁ—'

'বাঃ, ভারী চালাক ছেলে তো তুমি !' কুণাল পিঠ চাপড়ে দিলো টোম্যাটোর। শেষ হয়ে আসা সিগারেটের টুকরোটা দু-আঙুলের ফাঁক থেকে টোকা মেরে জলে ছুঁড়ে দিয়ে আর

একটা ধরালো সে। ভিড় বেড়ে গেছে, দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে এর মধ্যে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে আর ভালো লাগছিলো না তার। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কুণাল। 'আচ্ছা টোম্যাটো, আমি চলি—টা—টা—' বিদায়ের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে এগিয়ে চললো সে গাড়ীর দিকে।

টোম্যাটোও কিন্তু উঠে তার পেছন পেছনই এগিয়ে গেলো। কুণাল দরজা খুলে গাড়ীতে উঠতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে প্যাণ্টে টান পড়তেই ফিরে তাকিয়ে দেখে টোম্যাটো।

'আমি যাবো—' আবদারের সুরে বলে উঠলো টোম্যাটো।

'তুমি কোথায় যাবে!' হেসে সস্নেহে টোম্যাটোর মুঠো ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো কুণাল। টোম্যাটো কিন্তু মুঠো ছাড়তে চায় না। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'না, আমাকে ফেলে যাবে না—'

'কি মুশকিল—' বিব্রত হয়ে এদিক-ওদিক তাকালো কুণাল। 'তুমি কার সঙ্গে এসেছো—' ভোলাবার জন্যে আরও মিষ্টি হয় তার কথা। 'আচ্ছা, আরেকদিন এসে তোমাকে অনেক বেড়িয়ে আনবো, কেমন—' এবার জোর করেই টোম্যাটোর হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো কুণাল।

'না, আমাকে ফেলে যাবে না—' বেশ জোরেই কেঁদে উঠলো টোম্যাটো। 'বাবা আমাকে ফেলে যাচ্ছে, এ্যাঁ—'

'আরে বলে কি—কি কাণ্ড—' বিস্ময়ের অবধি থাকে না

কুণালের। তবে কি ছেলেটি তাকে তার বাবা বলে ভুল করেছে! এদিক-ওদিক ভালো করে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে সে, কাছাকাছি এর কেউ আছে কিনা।

টোম্যাটো কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, 'বাবা আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে এঁ্যা—'

কলকাতার জনতা জমবার জন্যেই মুখিয়ে আছে—অসংখ্য বিবর্ণ জীবনের জিভ যেন বেরিয়েই থাকে উত্তেজক কোনো ঘটনার স্বাদ গ্রহণের আশায়। এরই মধ্যে দু-দশজন লোক এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজন জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে মশাই?'

'কি হয়েছে তাকি ছাই আমিই জানি, আপনাকে বলবো!' কুণালের মুখে বিরক্তি দেখা দেয়। কৌতূহলী দর্শকদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'আঃ, কি বাবা-বাবা বলছো, কে তোমার বাবা, ছাড়ো তো এখন, যেতে দাও—' জোর করে টোম্যাটোর হাতটা ছাড়িয়ে দেয় কুণাল।

চেচিয়ে কেঁদে ওঠে টোম্যাটো, 'বাবা আমাকে ফেলে যাচ্ছে এঁ্যা—'

নিমেষে ভিড় বেশ ভারী হয়েই ঘিরে ধরেছে। তারই মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'আপনাকে ছাড়তে চাইছে না বুঝি? কার কাছে রেখে যেতে চাইছেন, তাকে বলুন না জোর করে নিয়ে যেতে।'

'আমি রেখে যেতেও চাইছি না, কার সঙ্গে এসেছে তাও

জানি না। বেঞ্চে বসেছিলাম, পাশে এসে বসলো। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, বলছে তোমার সঙ্গে যাবো, বলছে বাবা—কি কাণ্ড বলুন তো !'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কতক লোক হা হা করে হেসে ওঠে। একজন প্রশ্ন করে, 'এ আপনার ছেলে নয় ?'

'আরে না মশাই, বিয়েই করিনি, ছেলে—'

মাঝ থেকে বলে ওঠে একজন, 'বিয়ে করেননি, হঠাৎ লেকে এসে 'বাবা' বনে গেলেন—বাঃ, ব্যাপার মন্দ নয় তো !'

লোকটির কথা শুনে সমস্ত ভিড়টা আবার হেসে ওঠে।

চারিদিকে ভিড়। এমন একটা হাস্যকর অবস্থাকে আর বাড়তে দেওয়া চলে না। 'বাঃ, দেখতে-দেখতে বেশ একটি ভিড় জমিয়ে ফেলেছো দেখছি। এখন প্যান্টটা ছাড়ো তো, আমাকে যেতে দাও।'

'না, আমাকে ফেলে যাবে না—' ভিড় লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে টোম্যাটো, 'বাবা আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে এ্যাঁ—'

ভিড়ের একপাশে এক স্বাস্থ্যবান যুবক নীরবে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলো, এখন এগিয়ে এসে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কুণালকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি বলছেন আপনি একে চেনেন না ?'

'হ্যাঁ, তাই বলছি।' মেজাজের সঙ্গে জবাব দিলো কুণাল।

যুবকটি এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে জেরা করার ভাব নিয়ে

জিজ্ঞেস করে টোম্যাটোকে, 'খোকা, ইনি তোমার কে হন?'

'বাবা—বাবা আমাকে ফেলে যেতে চাইছে—' মরিয়া হয়ে টোম্যাটো বলে ওঠে বটে, কিন্তু তার বলা এবার তেমন জোর ধরে না। নিজেও সে ভয় পেয়েছে কিন্তু সন্দিগ্ধ ভিড়ের সেটুকু লক্ষ্যে পড়বার কথা নয়।

একজন বলে ওঠে, 'লেকের ধারে প্রেমে পড়া, জলে ডোবা, এসবই হতো জানতাম, এভাবে ছেলে ফেলে যাওয়াটাও সুরু হয়েছে তাহলে?' আর একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'খোকা তোমার মা কোথায়?'

'বাবা জানে—' টোম্যাটো নাকী সুরে জবাব দেয়।

গম্ভীর যুবকটি জনতাকে লক্ষ্য করে বলে, 'ভদ্রলোক বলছেন, তিনি বিয়ে করেননি, ছেলেটিকেও চেনেন না—ছেলেটি বলছে ইনি তার বাবা, মা কোথায় ইনিই জানেন—'

আবার হেসে ওঠে জনতা।

'না, শুনুন, এ হাসির কথা নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। আমার তো মনে হয় বিষয়টা পুলিসের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত।

ভিড় থেকে সমবেত সমর্থনে সাড়া ওঠে।

যুবকটি বলতে থাকে, 'ইনি ওর বাবা কিনা, এটি ওঁর ছেলে কিনা থানায় গিয়েই প্রমাণ হোক—আপনাদের মধ্যে কেউ চলে

যান না খবরটা একটু থানায় পৌঁছে দিতে, আমরা এঁকে আটক করে রাখছি।'

উৎসাহী লোকের অভাব হয় না।

'আমি যাচ্ছি, আসুন না মশাই আমার সঙ্গে—' বলে পাশের লোকটিকে টেনে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ে একজন।

এবার সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্বটা যেন উপলব্ধি করতে পারে কুণাল। অর্থহীন নির্বাক দৃষ্টি তার একবার ঘুরে আসে ভিড়ের ওপর দিয়ে। সহানুভূতির কোনো কণাও খুঁজে পায় না সেখানে। মুহূর্তে কি যেন ঘটে গেলো। কে এই ছেলে, কেন এই ভিড়, কি-ই বা সমস্যা, এ যে তার কাছেও মস্ত একটা প্রশ্ন! তবু যে দেরী করা চলে না। সন্দিগ্ধ এতগুলো লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, দুটো লোক রওনা হয়েছে থানায় খবর দিতে, এর পর বিভ্রান্ত না হয়ে সাময়িক একটা মুক্তির পথ বার করাই যে প্রাথমিক প্রয়োজন। বিপদের তীব্রতাই বুদ্ধি যোগায় কুণালের মাথায়। সহজ সরল একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে সে ভিড়ের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, মাথা ফিরিয়ে ডাকে, 'ও মশায়রা, থানায় যে যাচ্ছেন, শুনুন—'

থানাভিমুখী ব্যক্তিদ্বয় ফিরে এগিয়ে আসতে থাকে তার কথা শুনতে। কুণাল ততক্ষণে ভিড় লক্ষ্য করে বলতে সুরু করেছে, 'সাধে আমাদের জাতকে হুজুগে বলে! আগা-মাথা না বুঝেই ছুটলো কিনা থানা-পুলিস করতে। আরে মশায়রা,

ছেলেটা ভারী দুষ্টু আর জেদী, তাই একটু ভয় দেখাচ্ছিলাম—নিমেষের মধ্যেই দেখি ভিড় জমে গেছে। ভিড়টা জমলোই যখন, ভাবলাম একটু মজা করা যাক, কিন্তু কৌতুকটা যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে আর ভরসা না পেয়ে সত্যটাই বলে ফেলতে হলো : আয় টোম্যাটো চলে আয়—' সস্নেহে টোম্যাটোর হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে সে উঠে বসলো গাড়ীতে।

গম্ভীর যুবকটি গাড়ীর সামনে এগিয়ে এসে জমাট গলায় বললো, 'কিন্তু আপনাকে তো আমরা এতো সহজে ছেড়ে দিতে পারি না—বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

'বেশ, আর যখন কোনও কাজ নেই তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপরের বিষয়টাই পরিষ্কার করুন—' কুণালের ঠোঁটে শ্লেষের হাসি। 'থানায় খবর দিলে আপনারাই অপদস্থ হবেন—তা ছাড়া আমার ছেলেকে নিয়ে আমি যাচ্ছি, গা-জোরী গাড়ী আটক করলে ব্যাপারটা উল্টে এসে আপনাদের ওপর কতখানি পড়তে পারে, সেটাও একবার ভেবে দেখবেন।'

জনতার নিজেদের মধ্যে একবার চোখোচোখি হয়। একজন বলে ওঠে, 'ছেড়ে দিন, কি দরকার মশাই ঝামেলায় জড়িয়ে—নিজের ছেলেকে যদি কেউ পথে ফেলতে চায়, সে আর আমরা রুখতে পারবো কতক্ষণ—'

'ঠিক বলেছেন মশাই—'

গাড়ীতে স্টার্ট নেয় কুণাল, 'আপনার বুদ্ধি বিবেচনার জন্যে

ধন্যবাদ—নমস্কার সব্বাইকে—' বলে গাড়ীতে স্পীড্ দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

একটি বিমূঢ় লোক সাময়িক বুদ্ধির জোরে একটা বিমূঢ় জনতাকে পেছনে ফেলে যান্ত্রিক গতির সাহায্যে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেলো।

কুণালের দ্রুতগামী গাড়ী লেক ছাড়িয়ে এসে পড়লো সাদার্ন এ্যাভিন্যুতে। প্রথমটা একটানে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে এই একই রাস্তা ধরে সে রওনা হলো উল্টো দিকে। লেকের আশপাশ থেকে বেশীদূরে সরে যেতে ভরসা পাচ্ছিল না সে। কারণ সে ধরেই নিয়েছে ছেলেটি কাছাকাছিই কোথাও থাকে, একাই গিয়েছিলো বেড়াতে, একে নিয়ে এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরলে পথঘাট ওর ঘুলিয়ে যাবারই কথা, তখন পথ চিনে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া আরও তুরূহ হয়ে উঠবে।

কুণালের গাড়ী এ্যাভিন্যুর পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে জনবিরল জায়গায় এসে দাঁড়ালো একটি গাছের নিচে। গাড়ী দাঁড় করিয়ে বার তুই তাকালো কুণাল ছেলেটির মুখের দিকে, বললো, 'এবার বলো তো ত্যাঁদড় ছেলে, তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কি, পৌঁছে দিয়ে আসি—গাড়ী চড়ার জন্যে কি কৌশলটাই না করলে—

বাব্বাঃ, কি তুখোড় ছেলে, এখন বলো তো, বলো তো ঠিকানাটা, কোথায় থাকো ?'

'তোমার কাছে—' টোম্যাটোর গলায় সেই আবদারের সুর।

'আ-মলো যা— 'চটে স্টিয়ারিং-এ থাবড়া মারলো কুণাল। 'হতচ্ছাড়া ছেলে, মারবো কসে এক চড়।' .

'এ্যাঁ—না মারবে না—' চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো টোম্যাটো।

ভয় পেলো কুণাল। চেঁচিয়ে আবার না ভিড় জমিয়ে তোলে, আবার না একই দৃশ্যের অবতারণা হয়। 'না—না, মারবো না—' তাড়াতাড়ি টোম্যাটোকে শান্ত করতে চেষ্টা করলো কুণাল। 'আচ্ছা, আচ্ছা আমার কাছেই থাকিস—দাঁড়া, আগে তোর গাড়ী চড়ার শখটা মিটিয়ে দি।' টোম্যাটোর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে অনেকটা আপনমনে বলে, 'উঃ, কি ঝামেলা রে বাবা—'

গাড়ী ছেড়ে দেয় কুণাল। খানিকক্ষণ কাছাকাছি এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা জনবিরল জায়গা দেখে।

'কি, গাড়ী চড়ার শখ মিটলো তো ?' টোম্যাটোকে খুশী করার মতো একমুখ হেসে .আদর মেশানো সুরে বললো কুণাল, 'এখন বল তো কোথায় থাকিস—ঠিকানা না বলতে পারিস জায়গাটা—বাড়ীটা দেখতে কেমন, বাবার নাম কি বল, আমি খুঁজে বার করে ঠিক পৌঁছে দেবো।'

টোম্যাটোর মুখে সেই এক কথা 'আমি তোমার কাছে থাকি'।

বিমূঢ় কুণালের হঠাৎ মনে হয়, তবে কি ছেলেটির বাবার চেহারার সঙ্গে তার চেহারার মিল থেকেই এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে! ভুল ভাঙবার উদ্দেশ্য নিয়ে বললো কুণাল, 'আমার মতো এরকম পোশাক তোর বাবা তো পরে না—ধুতি পরে, না? আমাকে দেখতে বুঝি ঠিক তোর বাবার মতো?'

'তুমিই তো বাবা—' নিঃসন্দেহ নিশ্চয়তা টোম্যাটোর হাবভাবে ও কথায়।

এবার সত্যি সত্যি চিন্তিত হয়ে উঠলো কুণাল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, রাস্তার বাতি জ্বলে উঠেছে, এর পর এই ছেলেকে নিয়ে কোথায় যেতে পারে, কি সে করতে পারে? থানায় যাবার কথাটাও একবার মনে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে 'বাবা বাবা' করে আবার কোন ফ্যাসাদ বাধাবে কে জানে। এদিকে ব্যাপারটার কিছু একটা কিনারা করাও দরকার। কিন্তু কিনারা করবে কি, ঘটনার মাথামুণ্ডু কার্য-কারণ বোধগম্য হলে, তবে না একটা পথ ভাবা যায়। কারণ বুঝবার চেষ্টা ছাপিয়ে এবারে কুণালের মনে ছেলেটাকে কোনো প্রকারে ফেলে পালানোর মতলবটাই বড় হয়ে ওঠে। স্টিয়ারিং-এ আঙুল ঠুকে বুদ্ধি স্থির করতে চেষ্টা করে সে। মতলবও মাথায় একটা আসে।

বার দুই গাড়ীতে স্টার্ট নেবার ভাব দেখিয়ে হতাশার ভঙ্গীতেই বলে ওঠে কুণাল, 'এ্যাঃ, গাড়ী তো চলতে চাইছে না, কল বিগড়ে

গেলো নাকি !' গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে বনেট খুললো কুণাল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে এটা-সেটা নেড়ে-চেড়ে দেখে নিয়ে এগিয়ে গেল টোম্যাটোর দরজার কাছে। 'গাড়ীর কল বিগড়ে গেছে রে টোম্যাটো, তুই নেবে ঐখানটায় একটু দাঁড়া, তোর সীটের তলায় কল আছে কিনা, একটু মেরামত করতে হবে সেটা।'

এধার ওধার ও পেছনে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে সীটের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে বলে টোম্যাটো, 'আমি ঐখানটায় গিয়ে বসি—' পেছনের সীটটায় দেখিয়ে ডিঙিয়ে যাবার জন্যে পা তোলে সে।

'থাক, যেতে হবে না ঐখানটায়, বোসো তুমি।' দাঁতে দাঁত চেপে বললো কুণাল। একে ফেলে পালানো খুব সহজ হবে না বুঝতে পারে সে। অসহায় বিরক্তিতে গা-টা রি-রি করতে থাকে তার। চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে, 'টোম্যাটো— টোম্যাটো না ঝিঙে—না, তোর মতো ত্যাঁদড় ছেলের নাম হওয়া উচিত চিচিঙ্গে—'

'না, চিচিঙ্গে না, টোম্যাটো—' নাকী সুরে প্রতিবাদ জানায় টোম্যাটো।

'টোম্যাটো না কাঁচকলা—' রেগে বলে ওঠে কুণাল। ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে গিয়ে ঝপ করে বসে পড়ে তার সীটে। রেগে সমস্যার সমাধান হবে না, বোঝে কুণাল—কিন্তু কি-ই বা করা যায়। হঠাৎ মনে পড়ে নিখিলেশের কথা। নিখিলেশ তার

বন্ধু—ব্যারিস্টার। শুধু ব্যারিস্টার বলেই নয়, নিখিলেশের উপস্থিত বুদ্ধিটা বড়ই তীক্ষ্ণ। কুণালের বহু জটিল সমস্যায় অব্যর্থ মহৌষধির মতো কার্যকরী হয়েছে অনেকবার। তাই বিপদে পড়লে নিখিলেশের কথাটাই সবার আগে তার মনে পড়ে। নিখিলেশের বাড়ীর উদ্দেশে দ্রুত গাড়ী হাঁকিয়ে দেয় কুণাল।

গেটের সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে নাবলো কুণাল। 'চুপটি করে বোস গাড়ীতে, আমি আসছি।'

'না, আমি তোমার সঙ্গে যাবো—' সেই আবদারে নাকী স্বুর।

'আঃ—'

'নাঁ—'

'আচ্ছা, আচ্ছা বাপধন নেবে এসো—নইলে আবার চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করবে তো—' চাপা রাগে তার কথাগুলো যেন চেপ্টে যায়।

হাতল ঘুরিয়ে দরজা খোলে কুণাল। বড় বড় চোখ মেলে সেটাও লক্ষ্য করে টোম্যাটো। নেবেই টোম্যাটো হাত ধরলো কুণালের। হাত ছাড়িয়ে নিলো কুণাল। 'হাত ধরতে হবে না, পেছু পেছু চলে আয়—' বলে সে পা চালিয়ে দেয়।

বসবার ঘরে একটা কৌচে বসে নিখিলেশ বই পড়ছিলো, কুণাল ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো, 'এই যে ব্যারিস্টার

সাহেব, বাড়ীতেই আছিস দেখছি। শোন ভারী একটা বিপদে পড়ে তোর কাছে ছুটে এলাম—একটা বুদ্ধি বাতলে দে দেখি।'

'বোস—সঙ্গে এই ছেলেটি কে?' সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করে নিখিলেশ।

'আরে এই ছেলেকে নিয়েই তো যত বিপদ—' ঝপ করে একটা কৌচে গা ছেড়ে বসলো কুণাল। 'বাবার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে লেকে গিয়েছিলাম মাথা ঠাণ্ডা করতে—সেখান থেকে এই ছেলে পেছু নিয়েছে। কার ছেলে কিছু জানি না—'

'ছেলে পেছু নিয়েছে, বলিস কি!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় নিখিলেশ ছেলেটির দিকে। 'খোকা, তোমার বাবার নাম কি?'

কুণালের একটু গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলো টোম্যাটো, 'কুণাল সেন দি গ্রেট।'

'এ্যাঁ, কি বললে—' আঁতকে উঠলো নিখিলেশ।

জবাব শুনে প্রথমটায় কুণালও হাঁ হয়ে যায়। 'আরে ত্যাঁদড় ছেলে, নামটা বলেছিলাম তাও মনে করে রেখেছিস!'

নিখিলেশ আরও নিশ্চিত হবার জন্যে কুণালকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'খোকা, ইনি তোমার কে হন?'

'বাবা—'

নিখিলেশের দৃষ্টি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, সে তাকায় কুণালের দিকে। কুণাল কৌচের হাতলে একটা চড় মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, 'অমন করে তাকাচ্ছিস কি—আরে এই 'বাবা বাবা'

ডেকেই তো যত ফ্যাসাদে ফেলেছে। আমি বলি 'চিনি না', ছোকরা বলে 'বাবা'—রীতিমতো ভিড় জমে গেলো লেক-এ, কোনো উপায় না দেখে ওকে নিয়েই গাড়ী ছুটিয়ে পালিয়ে আসতে হলো।' উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে সুরু করলো কুণাল।

'বোস—বোস—' নিখিলেশের মুখে স্মিত হাসি, কণ্ঠ গম্ভীর। 'দেখ, উকিল ব্যারিস্টারের কাছে কিছু গোপন করে লাভ নেই—তা ছাড়া আমি তো তোর বন্ধুই। খুলে বল কবে কোথায় কি কেলেঙ্কারী করেছিলি, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলো, এখন কি করতে চাস ?'

'নন্‌সেন্স, নন্‌সেন্স—' ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে ওঠে কুণাল। 'বলছি, লেক-এ প্রথম দেখলাম—আমি কিচ্ছু জানি না, কিচ্ছু জানি না, এর চোদ্দ পুরুষের কাউকে চিনি না পর্যন্ত—'

'জানিস না, চিনিস না তো থানায় জমা দিয়ে দে না।' হাসে নিখিলেশ।

'আহা, কি বুদ্ধিই বাতলালেন! এ আর আমার মাথায় আসে নি, না ? আরে মূর্খ, থানায় গেলে বিপদ যে আরও বাড়বে। এ 'বাবা বাবা' করে চেঁচাবে, থানার লোক ফোন করবে বাবাকে, বাবা এসে তোমারই মতো একটা কিছু সন্দেহ করে বসবেন, তারপর সুরু হবে মহামারী কাণ্ড—' একদমে বলে চলে কুণাল। 'এমনিই তো আজ শাসিয়ে রেখেছেন, ত্যাজ্যপুত্র করবেন বলে—'

'বেশ তো, তাহলে এখন শান্ত হয়ে বসে খুলে বল দেখি সব। আমি তোর কাণ্ডকীর্তি কিছু না-জানি এমন তো নয়—আমার কাছে গোপন করার দরকারটা কি ?'

'ফু-ল্—ডোণ্ট, ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইওর হেল্প্—' সক্রোধে হিল ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো কুণাল। 'চাইনা·তোর সাহায্য—চলে আয় চিচিঙ্গে—'

'না—টোম্যাটো—'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ—টোম্যাটো। আয় চলে আয়—'

ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে এগিয়ে যায় কুণাল, পেছনে ছোটে টোম্যাটো।

আবার সেই গাড়ী। কিছুক্ষণ এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে উদ্দেশ্যহীন ভাবেই গাড়ী আবার এসে থামলো একটা ল্যাম্প-পোস্টের তলায়। তেমনি করেই কুণাল স্টিয়ারিং-এ আঙুল ঠুকে নতুন কোনো মুক্তির পথ খোঁজে। আবারও বুদ্ধি একটা মাথায় আসে বৈকি।—'টোম্যাটো, ক্ষিদে পেয়েছে ?'

'হুঁ।'

'খাবি ?'

'হুঁ।'

চলতে স্থুরু করে গাড়ী।

একটু পরেই দেখা যায় কুণাল টোম্যাটোকে নিয়ে ঢুকছে মধ্য কলকাতার একটা মাঝারি রকম রেস্টুরেণ্টে।

ভেতরে ঢুকে একটা খালি টেবিল বেছে নিয়ে কুণাল গিয়ে বসলো—পাশে টোম্যাটো। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে টোম্যাটো। তার চোখ দেখলেই বোঝা যায় এ-হেন স্থানে প্রবেশ তার এই প্রথম।

বয় এসে দাঁড়িয়েছে। কুণাল এক নিশ্বাসে অর্ডার দেয়, 'একে একটা অমলেট, একটা চপ, একটা কাটলেট, এক পীস পুডিং আর পেসট্রিজ—' একটু থেমে দম নিয়ে বলে, 'আমার জন্যে এক-কাপ চা—'

চোখ বড় করে একবার দুজনের দিকে তাকিয়ে চলে গেলো বেয়ারাটা।

'কি, এতেই পেট ভরবে, না আরও চাই ?' কেমন একটা জ্বালা নিয়েই প্রশ্ন করলো কুণাল।

'মুড়ি নেই ? লজেন্চুষ ?'

টোম্যাটোর প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্যে কুণালের মুখের সবটুকু রাগ আর জ্বালা যেন মিলিয়ে যায়। ছেলেটির এই খাদ্য নির্বাচন থেকে তার জীবনের পরিবেশের পরিচয়টাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে কুণালের চোখে। মুহূর্তের ভগ্নাংশে আরও নানা প্রশ্নও তার মনের ওপর দিয়ে পার হয়ে যায়। সে-সব একপাশে ঠেলে দিয়ে সে জবাব দেয়, 'না রে, এখানে মুড়ি নেই—লজেন্সের চেয়ে অনেক ভালো ভালো জিনিস বলেছি, খেয়ে দেখ, খুব ভালো লাগবে।'

পর পর তিন-চারটে ডিস এনে বেয়ারা সাজিয়ে দিলো টোম্যাটোর সামনে—কুণালের সামনে রাখে এক-কাপ চা। কুণাল প্রথমে অমলেটের ডিসটা টোম্যাটোর দিকে এগিয়ে দিয়ে চায়ে চুমুক দেয়। দেখতে দেখতে অমলেট উদরস্থ হলো টোম্যাটোর। কাটলেটটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আরও গোটা দুই চুমুক দিলো কুণাল তার পেয়ালায়, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তুই খেতে থাক টোম্যাটো, আমি একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি—' আঙুল দিয়ে প্রবেশপথের উল্টো দিকে বাথরুমের অবস্থানটা এমনভাবে সে দেখিয়ে দেয়, যাতে তার পলায়ন সম্পর্কে টোম্যাটোর মনে কোনো সন্দেহ না আসে। 'আর তা ছাড়া, দামটাও মিটিয়ে দিতে হবে কিনা—' খেতে খেতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো টোম্যাটো।

একটু এগিয়ে গিয়ে তার টেবিলের বয়কে হাতের ইশারায় ডাকলো সে। 'কতো হয়েছে ?'

'সাড়ে তিনটাকা।'

কুণাল দ্রুত পকেট থেকে চারটা টাকা বার করে বয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ল্যাভেটরিটা কোথায় রে ?'

'ওদিকটায় চলে যান।' বেয়ারা হাতের ইশারায় স্থানটা দেখিয়ে দেয়।

কুণাল জানে ল্যাভেটরির কাছাকাছি জমাদার ঢোকার একটা রাস্তা থাকেই, তারই ভেতর দিয়ে সে তার পালানোর পথ করে

নিতে পারবে। দ্রুত এগিয়ে গেল সে সেদিকে। হিসেব মতো পথও একটা পেলো। এর পর তার ছোটার আগ্রহ দেখে কে? দুইবাড়ীর মাঝখানকার অপরিচ্ছন্ন সরু পথ—দুপাশে দুটো ড্রেন, উপরন্তু এখানে সেখানে আবর্জনা তো আছেই। অন্ধকারে পড়ি-তো-মরি করে তারই ওপর দিয়ে ছুটলো কুণাল। হোঁচট খেয়ে দু-একবার না পড়লো এমনও নয়—জুতোয় ট্রাউজারে হাতে ধুলোকাদা মেখে কুণাল গিয়ে পড়লো ফুটপাথে—কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ফুটপাথ পেরিয়ে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো নিজের গাড়ীতে।

মুহূর্তে গাড়ীটা স্টার্ট নিয়ে সরীসৃপের মতো সোঁ করে এর-তার ফাঁক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো, তার ঘন শব্দিত হর্নের জ্বালায় আশপাশের লোকেদের শঙ্কিত করে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটে চলেছে গাড়ী—কুণালের মনে অপরিসীম একটা মুক্তির আনন্দ—যাক, ঝামেলা ঝেড়ে এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেলো। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে আনন্দের আতিশয্যে টা-রা-রা'র ভেতর দিয়ে দু-এক টান ইংরেজী সুরকে মুক্ত করে দেয় সে।

চৌরঙ্গীর এক মোড়ের মাথায় লালবাতি দেখে গাড়ী দাঁড় করাতে হলো তাকে। গাড়ী থামলো, কিন্তু সুর তখনও চলেছে কুণালের কণ্ঠে। হঠাৎ সুরও বন্ধ হলো। বিস্ফারিত কুণালের চোখ। স্টিয়ারিং-এর ঠিক ওপরেই ঝোলানো থাকে যে ছোট

আয়নাটি পশ্চাতের অবস্থার প্রতিবিম্বকে চোখের সামনে ধরে দিতে, তারই মধ্যে দেখতে পায় কুণাল, পেছনের সীটে ধীরে ধীরে উঠে বসছে শ্রীমান টোম্যাটো। কুণালের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসে। কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠ দিয়ে বেরোয় একটা করুণ স্বর। আসনের পিঠে গা ছেড়ে দিয়ে বলে সে, 'টোম্যাটো, মাণিক আমার, গাড়ীতেই আছো ?'

'হুঁ—সামনে আসবো—'

'এসো—' টোম্যাটোর স্বর নকল করে কুণাল। 'বাতি জ্বলবার আগে চটপট চলে এসো।'

তাড়াতাড়ি নেবে এসে বসলো টোম্যাটো কুণালের পাশে। জ্বলে উঠলো নীল বাতি, গাড়ীর পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়ে কুণালও এগিয়ে চললো। এখন আর কোনো তাড়াহুড়ো নেই তার। ধীরে গড়িয়ে চলেছে গাড়ী। টোম্যাটো নিঃশব্দ হলেও মুখ তার সক্রিয়।

'কি খাচ্ছিস রে ?' কৌতূহলী কুণাল প্রশ্ন করে।

'ঐ-যে তুমি কতো কি দিলে—খেতে কতো ভালো, খাবে তুমি ?'

'না বাপধন, যে ঘোল খাচ্ছি তার উপর আর কি খাওয়া যায়—ওঃ, কি হুঁদে ছেলে বাবা! পকেটে পুরে আবার খাবারগুলো নিয়ে এসেছে।'

টোম্যাটো খেতে থাকে, গাড়ী চলে, হতবাক কুণালের মাথায়

চলে দুর্ভাবনার ঝড়। এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই—অন্ততঃ আজকের রাতটার জন্যে ছেলেটাকে কোনো এক আশ্রয়ে রাখা দরকার। কিন্তু কোথায়? কাছ-ছাড়াই বা করবে কি করে? আবার আর একজনের কথা মনে পড়ে কুণালের। সে হলো মিলি। দু-মাস আগে যার সঙ্গে তার পরিচয়টা গড়িয়েছিলো অনেক দূর। আজ ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়ে থাকলেও মিলিকে যতটুকু সে চিনেছে তাতে এ ভরসা সে রাখে যে, তার বিপদে এটুকু সাহায্য না করে সে থাকতে পারবে না।

গাড়ীতে ব্রেক কষলো কুণাল। 'নাঃ, এভাবে ঘুরে কি হবে, চল বাড়ীই যাই—কি বলিস টোম্যাটো?' বলে টোম্যাটোর কোনো সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হয়ে পড়লো সে মিলির বাড়ীর উদ্দেশে।

রাত তখন ন'টা। কুণাল এসে বেল্ টিপলো মিলিদের বাড়ীর দরজায়। বেয়ারা এসে দরজা খুলেই কুণালকে দেখে সসম্ভ্রমে সেলাম জানায়। এ-বাড়ীর বেয়ারা-বাবুর্চির কাছে কুণাল সুপরিচিত।

'মিলি দিদিমণি শুয়ে পড়েছে ?'

'জী নেহি—আইয়ে।'

'যা, খবর দে আমি এসেছি।'

বেয়ারা ভেতরে চলে গেলো খবর দিতে। কুণাল টোম্যাটোকে একটা কৌচে বসিয়ে দিয়ে পায়চারি করতে লাগলো ঘরের মধ্যে।

চোখে মুখে বিস্ময় নিয়েই ঘরে এসে ঢুকলো মিলি। কুণালের আগমনটা তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। দু-মাস পূর্বে বেশ একটু তিক্ততা নিয়েই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, তারপর থেকে কুণাল আর এ-বাড়ীতে আসেনি। মিলিকে বিস্ময় প্রকাশ করার অবসর দিলো না কুণাল। টোম্যাটোকে দেখে কি-একটা প্রশ্নও করতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু বাধা দিয়ে কুণাল তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো সামনের ঝোলানো বারান্দায়। তারপর একনিশ্বাসে বিবৃত করলো তার বর্তমান বিপদের ইতিহাস।

রেলিং-এ হেলান দিয়ে মিলি শুনছিলো তার কথা—কুণালের বক্তব্য শেষ হলে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। 'হোয়াট এ কন্‌কক্‌টেড স্টোরি!' তার ঠোঁটের কোনে দেখা দিলো এক টুকরো বিদ্রূপের হাসি। 'যাই বলো, গল্পটা কিন্তু ভালো তৈরী করতে পারোনি কুণাল।'

'তৈরী করিনি বলেই হয়তো তেমন ভালো হয়নি।' হতাশার স্বর কুণালের কণ্ঠে।

'না—না, তোমার বুদ্ধিতে আর একটু বিশ্বাসযোগ্য কিছু বলা উচিত ছিলো।' বলে মুখ ফেরালো মিলি।

'লিস্‌ন্‌—লিস্‌ন্‌ মিলি—' সাগ্রহে ঝুঁকে পড়লো কুণাল মিলির মুখের কাছে। 'সত্যি বিশ্বাস করো, আমি একটি কথাও বানিয়ে বলছি না—পরে তোমার কাছে আমি প্রমাণ করবো—'

'পরের কথা থাক—' কুণালকে কথা শেষ করতে দেয় না মিলি। 'আর আমার কাছে সে সব প্রমাণ করবারই বা দরকার কি। এখন বলো দেখি, এ্যাদ্দিন পরে এই সত্য কাহিনীটি নিয়ে তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছো কেন—নিশ্চয়ই কোনো স্বার্থ আছে?'

'হ্যাঁ, তা একটু আছে—' বিনয়ে-অনুরোধে মাখামাখি হয়ে ওঠে কুণালের স্বর। 'একটা রাতের জন্যে এই ছেলেটাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে তোমার।'

'হো-অট !' আঁতকে উঠলো মিলি। 'তোমার এই ছেলেকে এখন তুমি আমার ঘাড়ে চাপাতে এসেছো !'

'না, না মিলি, চাপাতে আসিনি—প্লীজ, প্লীজ—শুধু একটা রাতের জন্যে—' আগ্রহে আকুলতায় তুহাত বাড়িয়ে মিলির কাঁধ তুটো সস্নেহে চেপে ধরলো কুণাল। 'আমি যতো অন্যায়ই তোমার ওপর করে থাকি, তবু জানি বিপদে পড়ে ছুটে আসতে হলে একমাত্র তোমার কাছেই আসা যায়।' ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ঝেড়ে বলে কুণাল, 'কারণ একদিন তুমি সত্যিই আমাকে ভালো-বেসেছিলে—'

'সেটা তুমি জানো দেখছি—' ধীরে কুণালের হাত তুটো কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয় মিলি। কুণালের এতোটা সান্নিধ্য আজও বুঝিবা একটু তুর্বল করে মিলিকে, কারণ তার ভালোবাসায় সত্যি কোনো চপলতা ছিলো না।

'জানি, জানি মিলি—' ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে নিজের মনের পুরনো আবেগ একটু যেন জেগে ওঠে কুণালের মধ্যে। তা ছাড়া শুতে যাবার আগেকার কেশবেশে মিলির ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুন্দর মুখখানা বড়ই লোভনীয় মনে হলো তার কাছে। এ আবেগের প্রশ্রয়টা বর্তমান স্বার্থের পথ আরও প্রশস্ত করবে মনে করেই হয়তো বা দৃষ্টির মুগ্ধতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে তার চোখে। সেভাবে একটু তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলতে থাকে,

'নেহাতই ঐ শেলী চ্যাটার্জির মতো একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে কেমন করে কি যে ঘটে গেলো—'

'থাক, কার পাল্লায় পড়ে কি ঘটেছিলো জানবার আমার দরকার নেই—' নিজেকে সামলে নিল মিলি। 'কিন্তু তোমার এই ছেলেকে এখন আমি রাখি কি করে—একটা চিল্‌ড্রেন্স হোমে দিয়ে দাও না।'

'চিল্‌ড্রেন্স হোম—দি আইডিয়া' একটা পথের হদিস পেয়ে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কুণালের। পরমুহূর্তেই অভিব্যক্তির বদলে আবার অনুরোধ জানাতে হয় কুণালকে, 'কিন্তু, সে তো আজ রাতেই হচ্ছে না—একটা রাতের জন্যে এটুকু তুমি ইচ্ছে করলেই করতে পারো মিলি। বাবা দিল্লীতে, বাড়ীতে একমাত্র বুড়ী পিসী—নিজে ভালো চাকরি করছো, তোমার উপরে কথা বলবে কে? পিসীকে যা হোক একটা বানিয়ে বলে দিলেই হবে—'

'বানিয়ে বলতে আমি পারবো না—মিথ্যা আমি বলি না—তা ছাড়া জানো নিশ্চয়ই মন্টির সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। সকাল ন'টায় রোজই সে আসে একবার, যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে তুমি আবার এখানে আসা-যাওয়া করছো তাহলে আর এক বিভ্রাট বাঁধবে।'

মিলি নিমরাজি হয়ে এসেছে টের পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলো কুণাল। 'না না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, মন্টি আসবার আগেই আমি এসে ওকে নিয়ে যাবো।'

'বিভ্রাটটা তাহলে বাঁধাতে চাও না দেখছি—' বাঁকা ঠোঁটে শ্লেষের ভাব ফুটে ওঠে মিলির।

'কি যে চাই তা আজ আর বোঝাবার সুযোগই বা পাচ্ছি কোথায়—' বেশ একটু আবেগপ্রবণতার সঙ্গে বললো কুণাল।

'থাক আর নাটক করতে হবে না—কাল্ল সকালেই এসে নিয়ে যেও কিন্তু।' বলে মিলি বারান্দা ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

পেছনে আসতে আসতে বলে কুণাল, 'নিশ্চয়ই, তুমি তো জানো তোমার মেজাজকে আমি কতোখানি ভয় করি।'

'হুঁঃ—ভয় করো না ছাই!'

ঘরের মাঝখানে এসে কি একটু ভেবে নিলো কুণাল। 'মিলি, তোমার বেয়ারাটাকে ডেকে এক গ্লাস খাবার জল দিতে বলো না—' মিলি ডাকতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'না থাক, এ্যাদ্দিন পরে এলাম, তোমার নিজের হাতে আনা এক গেলাস জলই খেয়ে যাই—আর তো কিছু ভাগ্যে জুটবে না।'

মিলি একটা কটাক্ষ হেনে চলে গেলো জল আনতে। কতদূর গেছে একটু দেখে নিয়ে কুণাল দ্রুত গিয়ে বসে পড়লো টোম্যাটোর কৌচের হাতলে। ঝুঁকে পড়ে-চাপা গলায় বললো টোম্যাটোকে, 'এটাই হলো আমাদের বাড়ী—আমাকে যেমন 'বাবা' ডেকেছিস, ওকেও তেমনি ডাকবি 'মা'—বুঝলি? মা তোকে কতো আদর করবে দেখবি—আমি তো এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে তোর জন্যে

একটা কাঠের ঘোড়া আর কলের লাট্টু কিনে আনবো, তারপর এসে একসঙ্গে কতো খেলা করবো—কেমন?'

মিলিকে জল নিয়ে আসতে দেখে চটপট কুণাল সোজা হয়ে বসে। মিলি সামনে আসতেই দাঁড়িয়ে উঠে গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নেয়, পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিয়ে বলে, 'আচ্ছা মিলি, মেনি থ্যাঙ্কস্—শোন টোম্যাটো, ঘোড়া আর লাট্টু নিয়ে এখুনি ফিরে আসছি আমি—'

বলে কাউকে আর কিছু বলতে সময় না নিয়ে দ্রুতপায়ে সে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

ঘটনার অস্বাভাবিকতায় ও কুণালের হাবে ভাবে মিলি যেন কিছুক্ষণের জন্যে হতবাক হয়ে থাকে। একটা কৌচে বসে পড়ে সে ভাবতে চেষ্টা করে ঘটনাটা কি, ছেলেটি কে, একে আশ্রয় দিয়ে সে-ই বা কাজটা ভালো করলো কিনা। হঠাৎ তার চমক ভাঙলো, টোম্যাটো চেঁচিয়ে ডাকছে, 'মা—মা—'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে মিলির চোখ। 'কি—কি বললি—'মা'—'

'হ্যাঁ—বাবা বলে গেলো তোমার নাম মা—'

'কুণাল বলে গেলো বুঝি!' রাগে হাত কচলাতে থাকে মিলি। 'উঃ, কি সাংঘাতিক লোক কুণাল—না, আমি মা-ফা নই, আর ওকথা মুখে আনবি না।'

বললে হবে কি—মুখ যার, সে এই নিষেধ মানে কই! বার বার ডেকে জানতে চায় বাবা কখন ফিরবে। তারপর ফিরে না-আসতে দেখেও কম চেঁচামেচি আর জ্বালাতন করে না। মিলি কখনও বা ধমকে, কখনও বা মিষ্টি কথায় কোনো প্রকারে শান্ত করে রাখে। ছেলেকে খাওয়াতেও কম ঝামেলা পোয়াতে হয় না মিলির। কুণাল না-ফেরা পর্যন্ত কিছুতেই খেতে চায় না টোম্যাটো। বাধ্য হয়েই বোঝাতে হয় মিলিকে, খেলনার দোকান অনেক—অনেক দূরে কিনা, তাই সেসব কেনাকাটা করে কুণাল আসবে কাল সকালে—নিশ্চয়ই আসবে।

খাওয়ার পালা শেষ হলে দেখা দেয় ঘুম পাড়ানোর সমস্যা। সেটা পিসীর হাতে ছেড়ে দিয়ে একটু হাঁফ ছাড়ার উদ্দেশ্য নিয়েই মিলি এসে বসলো বসবার ঘরে। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই পিসীর ঘনঘন ডাকে তাকে উঠতে হলো। শোবার ঘরে ঢুকে দেখে খাটে তুটো বালিশের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে আছে টোম্যাটো, অদূরে বসে পিসী, টোম্যাটো তার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে।

'কি হলো কি?' বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো মিলি পিসীকে। 'এতো ডাকাডাকি-করছো কেন?'

'দেখ্‌না কি নচ্ছার ছেলে, বলে—মা কতো সুন্দর, তুমি দেখতে বিচ্ছিরি, তোমার কথা শুনবো না—বলে—তোমার তুটো দাঁত কি হলো, ব'লে আমার দিকে তাকায় আর

ফিক ফিক করে হাসে। এ ছেলেকে ঘুম পাড়ানো আমার কম্ম নয়।'

খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো পিসী।

'বেশ, তুমি যাও, কর্ম যখন আমার—আমিই করছি।'

'দেখ মিলি—' কাছে এগিয়ে গিয়ে উপদেশের সুরে বলতে লাগলো পিসী, 'কুণালের মতো ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে তুই আবার এসব ঝামেলায় জড়াচ্ছিস, আমার কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে না বাপু।'

'এখন তো ওকে আমি সামলাই, পরে তুমি আমাকে সামলিও—যাও এখন শুয়ে পড়গে।'

'আমি ভালো কথাই বলছিলাম—' বলতে বলতে মুখ ভার করে বেরিয়ে যায় পিসী।

মিলি গিয়ে বসলো টোম্যাটোর পাশে। পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার চেহারাটা ভালো ?'

'হুঁ—'

'তবে আমার কথা শুনবি তো ?'

'না—'

'আরে বজ্জাত ছেলে—' এবার আর মিলি তেমন রাগ করে না। কে জানে রূপের স্বীকৃতিটা তার মনকে একটু নরম করেছে কিনা। 'আচ্ছা আয়, এই নে, দেখ কি সুন্দর ছবির বই—' হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিল থেকে কয়েকখানা বই টেনে নিয়ে

ছড়িয়ে দেয় টোম্যাটোর সামনে। 'এখন চুপটি করে শুয়ে ঘুমোলে কাল এমন আরও কতো দেবো দেখিস।'

'চাই না, চাই না ছবির বই—' হাত দিয়ে ঠেলে দিলো টোম্যাটো বইগুলো।

'উঃ, কি যে করি এই নচ্ছার ছেলেকে নিয়ে—' খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মিলি।

'আমি ঘুমোবো না, বাবার কাছে যাবো, মা—মা—'

'ফের 'মা মা' করছিস—বারণ করিনি ?'

'করবো তো—বাবা বলেছে তোমার নাম মা।'

'আর আমি যে নিষেধ করছি—উঃ, কি ঝঞ্ঝাট রে বাবা—এখন কি করে এই ছেলেকে সামলাই—' উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করে মিলি। একটা নতুন পন্থা স্থির করে নিয়ে শান্তভাবে একটু হেসে টোম্যাটোর কাঁধে হাত রেখে বললো, 'টোম্যাটো, লক্ষ্মীটি, আর চেঁচামেচি না করে এখন ঘুমো তো।'

টোম্যাটোও মিলির মতো সুর নকল করে আবদারের সুরে বললো, 'না, ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না—'

'আচ্ছা টোম্যাটো, গান শুনবি—গান ?' কষ্টকৃত উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো মিলি।

'শুনবো।'

'তাহলে চুপটি করে শোও, আমি গাইছি।'

এতোখানি বিরক্তি নিয়ে গান গাওয়া সহজ নয়। তবু গাইতে হয় মিলিকে। চাপা কণ্ঠে গান ধরলো সে। গান শুনে টোম্যাটোও কিন্তু শান্ত হয়েই শুলো। কিছুক্ষণের মধ্যে টোম্যাটোর চোখ বুঁজে এলো। মিলির চোখের পাতাও ভেরে আসছিলো, গাইতে গাইতে সেও পড়লো ঘুমিয়ে।

হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে মিলির ঘুম ভাঙলো। চোখ চেয়েই দেখে টোম্যাটো উঠে বসেছে। তাকে জাগতে দেখেই একটা ঠেলা দিয়ে বলে ওঠে, 'মা, ঘুমোচ্ছ কেন? গাইবে না—'

সকালবেলা কুণাল তার শোবার ঘরে ইজি-চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে। পাশে টি-পয়ের ওপরে ট্রেতে ছোট-হাজরীর ভুক্তাবশিষ্ট। বেয়ারা এসে জানালো, 'ফোন এসেছে, মা ডাকছেন।'

'কে ধরেছে ফোন—মা?' ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলো কুণাল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কাগজ ফেলে উঠে দাঁড়ালো সে। দ্রুতপায়ে গিয়ে ঢুকলো ড্রইংরুমে।

ঢুকতেই মা এগিয়ে এসে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'তুই আবার মিলিদের বাড়ি যাওয়া-আসা করছিস?'

'না তো—'

'এই যে বললো, কাল গিয়েছিলি।'

'ও কিছু না—' বিব্রত হয় কুণাল। 'কাল এমনি একবার ডেকেছিলো ওর বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শ করতে।'

'পরামর্শ করতে—তোর সঙ্গে! এতো মিথ্যেও বলতে পারিস।'

'তুমি যে আমাকে কি ভাবো—' বলে কুণাল এগিয়ে গিয়ে ফোন তুলে নেয়। 'হ্যাল্লো—কুণাল কথা বলছি—'

ফোনের উল্টো মাথায় দাঁড়িয়ে মিলি। মুখে অপরিসীম

বিরক্তি, ফোনের মুখে ফেটে পড়ে তার কণ্ঠ, 'আটটা বেজে গেলো, এখনও তোমার দেখা নেই—দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে আছো —এদিকে তোমার ছেলে যে আমাকে পাগল করে দিলে। কাল সারা রাত আমাকে ঘুমোতে দেয়নি—এক্ষুনি তুমি আসবে কিনা—'

এধারে মিলির ক্রুদ্ধকণ্ঠে ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ অদূরে দাঁড়িয়ে শুনতে পান কুণালের মা। 'আবার কি গোলমাল বাধিয়েছিস', চাপা গলায় বলেন তিনি, 'অমন রেগে রেগে কি সব বলছে ?'

ফোনের মুখ চেপে ধরলো কুণাল। 'ও কিচ্ছু না—এমনি একবার যেতে বলছে।' ফোনের মুখ ছেড়ে দিয়ে মিলিকে বলে 'আচ্ছা আচ্ছা, আমি এক্ষুনি আসছি'—মাকে ভুল বোঝানোর জন্যে মুখে চোখে মহা খুশীর ভাব ফুটিয়ে তুলে বলে, 'তোমার নতুন সুখবর পেয়ে আমি ছুটে আসবো না—ভারী খুশী হলাম, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌, হাঃ হাঃ—'

টকটকে লাল হয়ে ওঠে মিলির মুখ। 'বাঃ, তুমি আমার কথা শুনে হাসছো—বলছো খুশী হয়েছো ! তুমি মানুষ, না আর কিছু ! একটু পরেই মন্টি আসবে। এক্ষুনি এসে একে না নিয়ে যাও তো আমিই পৌঁছে দিয়ে আসবো তোমার বাড়ীতে।'

মিলির ক্রোধের মাত্রা বাড়লেও কুণাল নিরুপায়। মা সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে ভুল বোঝানোর চেয়েও বড় কথা, এটুকু বোঝানো যে, এর মধ্যে গোলযোগের লেশমাত্র নেই।

তাই কুণাল যেমন হাসছিলো তেমনি হাসতে হাসতেই অংসলগ্ন অর্থহীন ভাবেই বলতে হয় তাকে, 'গুড্, গুড্, থ্যাঙ্কস্—কিচ্ছু ভাবনা নেই, আমি এক্ষুনি আসছি—'

ঝপ করে ফোনটা নামিয়ে রাখে কুণাল।

'মিলির বিয়ে নিয়ে কোনো গণ্ডগোল বাধাসনি তো?' কুণালের মার শঙ্কা কাটে না।

'আরে না—না, কি যে বাজে বকো—' খুব একটা আবদারের ভাব নিয়ে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো কুণাল। 'শ-পাঁচেক টাকা দাওনা মা—বড্ড দরকার।'

'কাল উনি কি বলেছেন এরই মধ্যে ভুলে গেলি? জানতে পারলে তোর সঙ্গে আমাকেও বাড়ীছাড়া করবেন।'

'তোমার লুকনো পুঁজি থেকে দাও—কেউ জানতে পারবে না, কথা দিচ্ছি—ওঅর্ড অব অনার।'

একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন কুণালের মা, 'বেশ, দিতে পারি, যদি কথা দিস বিয়ে করবি।'

'কথা দিচ্ছি—' সোৎসাহে বলে উঠলো কুণাল। 'কালী, আল্লা, যীশু, ভগবান—ইন্ দি নেম অব অল্—আমি লতাকে বিয়ে করবো, বাবাকে বলে দাও কালই পাকা কথা বলতে।'

'টাকার জন্যে শেষপর্যন্ত তুই লতাকে বিয়ে করবি!'

গম্ভীর হয়ে ওঠে কুণালের মুখ। শান্ত কণ্ঠে বলে, 'না—না,

টাকা-ফাকা নয়—সুন্দরী তো কতো দেখলাম, রূপ নিয়ে কি হবে মা—স্বভাবটাই বড়।'

বড় বড় চোখ করে মা তাকালেন কুণালের মুখের দিকে।

কুণাল বলে চললো, 'লতা মেয়েটা শান্ত সরল—বৌ হিসেবে ও তোমাকে সত্যিই খুশী করতে পারবে মা। তা ছাড়া পরিবারটাও তো দেখতে হবে?'

'উঃ, তোর আজ হলো কি!' বিস্ময়ে মার মুখে যেন কথা সরতে চায় না। 'সব ভালো ভালো কথা বলতে সুরু করলি যে—বেশ, তবে তাই কর, আমি ওঁকে আজই বলছি। বৌ পছন্দ-অপছন্দ ছেড়ে উনি তো এখন নাতির জন্যেই ক্ষেপে উঠেছেন বেশী।'

সত্যিও তাই। কুণালের বাবা শিবনাথ বড় বড় ঘরের অনেক সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার সঙ্গে সম্বন্ধ এনেও পুত্রকে বিয়েতে রাজি করাতে পারেন নি। বিবাহে পুত্রের এই অনিচ্ছাকে তার চারিত্রিক ত্রুটি হিসেবে মেনে নিয়েই শেষপর্যন্ত চেষ্টায় ছেদ টানতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর সম্পত্তি ও সঞ্চিত অর্থের প্রবাহকে পুত্র-পরবর্তী কালে কল্পনায় প্রসারিত করার সুযোগ না পেয়ে খুবই একটা অস্বস্তিবোধ চলছে শিবনাথের মধ্যে। যার গুরুত্ব কুণালের মতো ছেলের বুঝবার কথা নয়।

'নাতির কথা জানি না—বিয়ে করার কথা তো দিলাম, এখন চটপট টাকাটা বার করে দাও তো, মা—লক্ষ্মীটি!' বলে গলা জড়িয়ে মাকে টেনে নিয়ে যায় তার ঘরের দিকে।

মিলিদের বসবার ঘরে তখন চলছে মহামারী কাণ্ড। ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে পায়চারি করছে মিলি, ঠিক তার পেছন পেছন ঘুরছে টোম্যাটো। মিলি থামে তো টোম্যাটোও থামে। থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে টোম্যাটো, 'বাবা আসছে না কেন? মা—মা—'

'ফের মা-মা করে চেঁচাচ্ছিস?' মিলির কণ্ঠেরও বাঁধ ভেঙে যায়।

'হ্যাঁ, চেঁচাবো তো—'

'না, চেঁচাবে না—' টোম্যাটোর কণ্ঠকে ছাপিয়ে ওঠে মিলি, 'কাল থেকে চেঁচামেচি করে আমাকে পাগল করে তুলেছো তুমি—'

ঠিক এমনি সময় ঘরে এসে ঢুকলো কুণাল। তাকে দেখে নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলো মিলি, 'উঃ, বাঁচালে! ও নিশ্চয়ই তোমার ছেলে, নইলে এমন ত্যাঁদড় কখনই হতে পারে না।'

'হা হতোস্মি—' দুহাত ছড়িয়ে হতাশার ভাব নিয়ে একটা কৌচে বসে পড়লো কুণাল।

'আবার বসলে কেন? ওকে নিয়ে এক্ষুনি বিদেয় হও দেখি।'

'একটু বসতেও দেবে না—' ক্লান্ত ম্লান মুখে বলে কুণাল।

সেটুকু লক্ষ্য না করবার জন্যেই মুখ ফিরিয়ে নিল মিলি।

'আচ্ছা তবে চলি—' উঠে দাঁড়ালো কুণাল। 'আয় টোম্যাটো—'

উৎসাহের সঙ্গে ছুটে যায় টোম্যাটো মিলির কাছে। 'মা—মা, বাবার সঙ্গে চলে যাচ্ছি আমি।'

টোম্যাটোর ছোট্ট হাতখানা চেপে ধরে বেদনাহত দৃষ্টি নিয়ে এবার তাকালো মিলি কুণালের চোখের দিকে।

'কেন—কেন ওকে এভাবে ডাকতে শিখিয়েছো তুমি—'

কোনো জবাব দিলো না কুণাল। ধীরে চোখ নামিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে। টোম্যাটোও মিলির চেপে ধরা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অনুসরণ করলো কুণালকে।

হঠাৎ কেমন চঞ্চল বোধ করলো মিলি ; টেবিলের ওপর চোখ পড়তেই কিছু যেন একটা পেয়েছে এমনি ভাবে চকোলেটের ঠোঙাটা তুলে নিয়ে ডাকে সে, 'টোম্যাটো—'। ডাক শুনে টোম্যাটো ছুটে আসে। 'তোর চকোলেট।'

ঠোঙাটা হাতে নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যায় টোম্যাটো।

কুণাল টোম্যাটো চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইলো মিলি, তারপর সে গা-ছেড়ে বসে পড়লো একটা কৌচে। পিসী পাশের ঘরেই ছিলো, বেরিয়ে এসে বললো, 'আপদ বিদেয় হলো ?'

'হ্যাঁ, হলো। খুশী হলে তো ?'

'আমার খুশী-অখুশীর কি আছে ? কাল থেকে তুই-ই অস্থির হয়ে উঠেছিলি, তাই বললাম। —এই যে মন্টি এলো। —এসো, বোসো—' বলে ভেতরে চলে গেলো পিসী।

মন্টি ঘরে ঢুকে মিলির চোখমুখ লক্ষ্য করে প্রথমেই প্রশ্ন করে, 'ওকি, তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

'না কিছু না—শরীরটা তেমন ভালো নেই।'

সবকিছু নিয়ে একটু কৌতুক করবার লোভ আছে মন্টির। 'যাক, বাঁচা গেল।' যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বসলো সে।

'তার মানে?'

'মানে, নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো, মনটা যে ভালো আছে এটুকু জেনে।'

'কেন, মেয়েদের শরীরটা বুঝি কিছুই নয়?'

'আরে, না না—' জিভ কাটে মন্টি। 'শরীরটাই যদি কিছু না হবে তবে শাড়ী, গয়না, পমেড, পাউডার—এতসব আয়োজন কেন!' বলে নিজের কৌতুকে নিজেই হা হা করে হেসে ওঠে।

মন্টিও ধনীর পুত্র—ইঞ্জিনিয়ার। চাকরির ক্ষেত্রে তার পদ-মর্যাদাটাও উল্লেখযোগ্য—তবু মিলির চোখে মন্টিকে যেন আজ বড়ই নিষ্প্রভ আর বর্ণহীন ঠেকলো।

মিলিদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে নানা জায়গায় খোঁজখবর নিয়ে কুণাল টোম্যাটোকে নিয়ে হাজির হলো গিয়ে বড়রকমের একটা চিল্‌ড্রেন্স হোমে।

সুপারিন্‌টেনডেন্টের আপিস-ঘরের দরজার সামনে টুলে বসে ঝিমোচ্ছে চাপরাসী। কুণাল কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সুপারিন্‌টেনডেন্ট আছেন ?'

চাপরাসী মোটেই আমল দিলো না ; আধবোজা-চোখে বসে-বসেই বললো, 'আছেন—ছেলে ভর্তি করতে চান, সীট নেই।'

'কাগজ দাও—আমি একটা স্লিপ দিচ্ছি।' পকেট থেকে কলম বার করলো কুণাল।

'ভর্তির ব্যাপারে স্লিপ নিয়ে যাওয়ার হুকুম নেই।'

বড়ই বেয়াড়া রকমের বেয়ারা তো! রাগ হয় কুণালের। রাগ হলেও রাগিয়ে দেওয়া চলে না। বরং খুশী করাই দরকার। ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার দুই খসখস শব্দ করে একখানা দশটাকার নোট কুণাল টেনে বার করলো পকেটের মুখ অবধি। নোটের ডগাটি চোখে পড়তেই বেয়ারার মুখে স্পষ্ট ভাবান্তর ঘটে—নিদ্রালু চোখ সজাগ হয়, মুখে দেখা দেয় সবিনয় হাসি।

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বেয়ারা।

'সীট আছে ?' নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলো কুণাল।

তার চেয়েও চাপা গলায় উত্তর এলো, 'ছিলো না। গতকাল একটা খালি হয়েছে।'

'একবার দেখা করার ব্যবস্থা করো।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়—' ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠলো বেয়ারা। 'আপনি একটু দাঁড়ান—' বেয়ারা ঢুকে গেলো অফিস কামরায়।

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট মিস মণিকা ব্যানার্জি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছেন। বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। চেহারা এককালে মন্দ ছিলো না; বয়স আর শিক্ষকতার কাঠিন্যের তলায় সেটুকু চাপা পড়ে গেছে। রাসভারী স্বভাব; তাই ভয় করে সবাই। শুধু এই পুরোনো বেয়ারাটাই যা-কিছু আবদার চালায় মিস মণিকার ওপরে।

'দিদিমণি—'

কথার অবতারণা করতে চেষ্টা করে বেয়ারা। মণিকা মুখ তোলে না, কোনো জবাবও দেয় না। এতে অভ্যস্ত বেয়ারা, তাই সে তার কথা বলে চলে, 'বিরাট এক গাড়ী করে মস্ত এক ধনী ভদ্রলোক এসেছেন—চেহারা দেখলে মনে হয় রাজ-পুত্তুর।'

'চেহারার কথা থাক, কি চান ?' ভারী গলায় জবাব এলো।

'ছেলে ভর্তি করতে এসেছেন।' বিগলিত সুর বেয়ারার।

এবার মুখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে তাকালো মিস মণিকা। 'সীট নেই বলিসনি ?'

'বলেছি—' ঢোঁক গিললো বেয়ারা। আমতা আমতা করে বললো, 'তবু বললেন—একবার দেখা তো করি, উনি চেষ্টা করলে ব্যবস্থা একটা হবেই।'

'না, ব্যবস্থা হবার কোনও উপায় নেই।'

গোপনকথা বলবার ভঙ্গী করলো বেয়ারা। 'কেন, কাল যে একটা সীট খালি হলো দিদিমণি ?'

'বখশিশ খেয়ে সে-খবরটি বলা হয়েছে বুঝি ?'

'না, সে কথা ওখানে বললাম কই—আপনাকে তো বলেছি।'

'ও সীট দেওয়া হবে না, ওর জন্যে অন্য ছেলে রয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে তবুও আবদারের সুরে বললো বেয়ারা, 'ডেকে দেবো ?'

বিরক্ত হয়ে বেয়ারার সুর নকল করে বলে উঠলো মণিকা, 'দাও, এসে খানিকক্ষণ জ্বালিয়ে যাক—তোমার মতলব বুঝিনি কি !'

একমুখ হাসলো বেয়ারা। দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে কুণালকে ডেকে এনে বসতে ইঙ্গিত করে সরে গেলো সে।

নিজের কাজ করে চলে মণিকা, মুখ তুলে একটু অভ্যর্থনাও জানায় না। নমস্কার জানিয়ে চেয়ার টেনে বসলো কুণাল। পাশের চেয়ারে টোম্যাটো।

খানিকক্ষণ চুপচাপ এভাবেই কেটে গেলো। মাঝে শুধু একবার মণিকা তার ছোট্ট রুমাল তুলে নারীসুলভ-সঙ্কোচ-বহির্ভূত সহজতায় নাক ঝাড়লো। অস্বস্তিতে নড়ে-চড়ে বসলো কুণাল।

কতক্ষণ আর এভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায়; কথার অবতারণা করতে চেষ্টা করলো সে, 'প্লীজ—'

উল্টো-তরফ লেখা থেকে মুখ না তুলেই শুধু কলম উঁচিয়ে তাকে থামিয়ে দিলো।

আবার চুপচাপ। কাজ সেরে নেবার অবসর দিতেই বুঝিবা কুণাল সময় কাটানোর মতো কোনো একটা কিছুর দিকে মনোযোগ দিতে চায়। নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে সে এগিয়ে যায় দেওয়ালে টাঙানো গ্রুপ ফটোটার কাছে। ফটোতে চিল্‌ড্রেন্স হোম-এর সমস্ত ছেলেমেয়েদের মাঝে বসে আছে মণিকা। মনোযোগ দিয়ে দেখতে গিয়ে তার ঠোঁটের কোণায় ফুটে ওঠে মৃদু হাসি, বুদ্ধিও যেন একটা মাথায় আসে। আর একটা ফটোর দিকে এগোতে গিয়ে জুতোর শব্দ হয়।

'এটা পার্ক নয়—' কঠোর কণ্ঠ শোনা যায় মণিকার।

'অ— সরি—'

কুণাল ফিরে এসে বসলো চেয়ারে। এবার তার বুদ্ধিটা প্রয়োগ করতে ঝুঁকে পড়ে বলে উঠলো সে, 'এক্স্‌কিউজ মি—' মণিকার বাধা অগ্রাহ্য করেই বলে চলে, 'দেওয়ালে টাঙানো

এই গ্রুপ ফটোতে ঐ যে সুন্দরী মহিলাটি রয়েছেন—' থেমে ছবিটা হাতের নির্দেশে দেখালো কুণাল। ওষুধ ধরেছে বলেই মনে হলো, কারণ মণিকা চোখ তুলে এবার তাকালো তার হাতের নির্দেশ মতো। 'ওঁকে কোথায় দেখেছি, পরিচিত মনে হচ্ছে—কে, বলতে আপত্তি আছে কি?'

পূর্বের কঠোরভাব যথাসম্ভব বজায় রেখে বললো মণিকা, 'দেখুন কারুর সঙ্গে মেলে কিনা—তবে আপনার পরিচিত নয়, কারণ আপনাকে আমি চিনি না।' এবার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসিও দেখা দিলো মণিকার।

'অ—সরি—' ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার ছবিটা দেখে নেয় কুণাল। 'তাই তো—ও তো আপনারই ছবি দেখছি! নাঃ, বেশীদিন টীচারি করলে চেহারায় কেমন একটা এক্সট্রা হার্ড্‌নেস এনে দেয়।' ফটো আর মণিকার মুখের দিকে হাতটাকে দুলিয়ে দিয়ে বলে, 'এক চেহারা—তবু যেন চেনা যায় না।'

বেশ একটু বিব্রত হয়ে বার দুই রুমাল দিয়ে নাক মুছলো মণিকা। 'যাক, কি বলতে চান বলুন তো—বেয়ারা তো বলেছে, সীট নেই—'

টেবিলে আর একটু ঝুঁকে পড়ে ঘনিষ্ঠ হবার ভাব দেখালো কুণাল। 'সে আমি জানি না, ব্যবস্থা একটা করে দিতেই হবে আপনাকে—' বহু চর্চায় শানানো-দৃষ্টি কুণালের এবার মুগ্ধতা নিয়ে তাকালো মণিকার চোখের দিকে।

চোখ নামিয়ে নিলো মণিকা। 'নাঃ, আপনারা এমনভাবে এসে ধরে পড়েন—' মণিকার স্বর অনেক নরম। 'সীট নেই, কি যে করি—আচ্ছা বসুন, দেখি একটা কিছু করা সম্ভব কিনা।'

সীটের ব্যবস্থা করা যায় কিনা বুঝে দেখতে ভেতরে চলে গেলো মণিকা। কিন্তু দেখা গেল ভেতরে ঢুকে সে সোজা গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে। আয়নায় নিজের মুখ ভালো করে একবার দেখে নিয়ে চুলটা একটু ঠিক করে ফিরে এলো আপিস-ঘরে। নিজের চেয়ারটিতে বসতে বসতে বললো, 'কি আর করি বলুন, যে ভাবে বলছেন, এক্সট্রা একটা সীটের ব্যবস্থাই করতে হলো—'

খুব একটা কিছু বলতে হয়েছে তাকে কুণাল তা মনে করে না। সে যে, এমনকি, করজোড়ে আরও অনেক কিছুই বলবার জন্যে প্রস্তুত ছিলো। নারীচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতার জোরেই না কাজটা এতো সংক্ষেপে সে সারতে পারলো। মনে মনে একটু হাসলো কুণাল। মুখে বললো, 'অ— সো কাইণ্ড অব ইউ— ধন্যবাদ—'

'বাবা চলো।' আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠলো টোম্যাটো।

'অ? আপনার ছেলে?'

উত্তর দিতে একবার একটু দ্বিধা করে কুণাল। এর পর অন্য কিছু বলাও সম্ভব নয়। গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে বলে,

'হ্যাঁ—দেখুন না, কি বিপদেই পড়েছি! কিছুদিন হলো স্ত্রী মারা গেছেন, আমার আবার ঘুরে বেড়ানোর চাকরি, আজ কলকাতায় তো কাল দিল্লী, কি যে করি—তাই না আপনাকে এভাবে বলা? মান্থলি কতো চার্জ?'

'সব মিলিয়ে একশো।'

'ঠিক আছে। আমি কখন কোথায় থাকি তার কোনো স্থিরতা নেই। তাই তিন মাসের ফীজ একসঙ্গেই জমা দিয়ে যাচ্ছি।'

পার্স্ বার করে তিনখানা একশো টাকার নোট রাখলো কুণাল টেবিলে। 'আমি এখানে থাকলে তো দু-চার দিনের জন্যে গিয়ে—তা ছাড়া ওর সম্বন্ধে কোনো খবর দিতে হলে, এই ঠিকানায় দেবেন কাইণ্ড্লি—ঠিকানাটা টুকে রাখুন।' মিলির ঠিকানাই দেবে, ইতিমধ্যে তাও সে স্থির করে নিয়েছে—মিলি যত রাগই করুক, প্রয়োজন মতো সামলে নিতে সময় সে তাকে একটু দেবেই।

'নাম ঠিকানা রাখতে হবে বৈকি, বলুন—' একটা ফর্ম্ টেনে নিলো মণিকা। 'ফাদার—?'

'কুণাল সেন।'

'বয়—?'

'টোম্যাটো সেন।'

একটু হেসে টোম্যাটোর দিকে একবার তাকালো মণিকা।

'এ্যাড্রেস্?'

'কেয়ার অব মিস মিলি রয়—আমার পিসতুতো বোন, কলকাতায় ওর ওখানেই উঠি কিনা—নাম্বার থ্রি রেনী-পার্ক।'

মণিকা ফর্‌ম্‌-এ আর যা-যা লিখবার লিখে সেটা সই করিয়ে নিলো কুণালকে দিয়ে। মণিকা যখন জানালো আর কিছু করবার নেই তখন তাকে ইংরেজিতে জানালো কুণাল যে, ছেলে ভারী দুষ্টু আর জেদী—তাকে সহজে ছাড়তেও চাইবে না। ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটু ভেতরে নেবার ব্যবস্থা করলে বড়ই ভালো হয়।

মণিকাও ইংরেজিতেই জানায় এর চেয়ে কতো বেশী দুষ্টু ছেলে-মেয়ে দুবেলা তাদের শায়েস্তা করতে হয়। কিন্তু কুণাল তো জানে টোম্যাটোকে রেখে বেরুতে গেলে কি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে সে, তাই কিছুর একটা লোভ দেখিয়ে ওকে একবার ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানায়।

মণিকা ডাকলো আয়াকে। আয়া এলে তাকে বললো, টোম্যাটোকে নিয়ে গিয়ে তার ঘর থেকে কিছু লজেন্স আর টফি দিতে।

'যা, চটপট নিয়ে চলে আয়, আমি বসছি।' উৎসাহ দিতে বলে উঠলো কুণাল।

টোম্যাটোর দ্বিধার ফাঁকে-তাকে একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে যায় আয়া। কুণাল উঠে দাঁড়িয়ে চট-জলদি একটি নমস্কার আর ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো আপিস থেকে। বেয়ারা তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলো, গুঁজে দেওয়ার মতো ফাঁক

রেখেই তুহাত জোড় করে সে নমস্কার জানালো কুণালকে। চট করে সেখানে একটা নোট গুঁজে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠলো কুণাল গাড়ীতে। লাফ মেরে গাড়ী স্পীড নিয়ে বেরিয়ে গেল। কুণালের মুখে চোখে মুক্তির আনন্দ। ঘন ঘন হর্ন দিয়ে ভিড় কাটিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ী, হঠাৎ আবেগে তুহাত ছড়িয়ে বলে উঠলো কুণাল, 'ফ্রি—আই আম ফ্রি—' চমকে উঠে খপ করে ধরলো সে স্টিয়ারিং—চাপা দিয়েছিলো আর কি একটা লোককে ! কোনোরকমে তুর্ঘটনা কাটিয়ে আবার চলতে স্থুরু করলো সে।

এ ঘটনার দিন তুই পরে সকালের দিকে কুণাল সেজেগুজে পা বাড়িয়েছে বেরোবে বলে, দরজার মুখেই দেখা শিবনাথের সঙ্গে। বাবাকে দেখে দাঁড়ালো কুণাল।

'একটু কথার দরকার ছিলো তোমার সঙ্গে, তোমার ঘরেই যাচ্ছিলাম' বললেন শিবনাথ—'হ্যাঁ শোনো, বেশ ভেবেচিন্তে বলেছো তো—আমি তাহলে লতার বাবাকে খবর পাঠিয়ে দি কালই সকালে এসে পাকা কথা কয়ে যেতে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' মাথা নিচু করলো কুণাল। 'আমি ভেবেচিন্তেই বলেছি।'

'হুঁ।' একটা ভারী গম্ভীর আওয়াজ বেরিয়ে এলো শিবনাথের গলা দিয়ে। 'তোমার ভেবেচিন্তে বলার ফল যে কি সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাক, দেখো এবার যেন আর আমাকে

কোনওরকম অপদস্থ কোরো না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন শিবনাথ, 'বে-থা করতে যাচ্ছ, এখন থেকে স্বভাবটা একটু বদলাতে চেষ্টা করো। —কোথায় যাচ্ছ?'

'লতাদের ওখানে।'

'আচ্ছা যাও।'

সুবোধ বালকের মতো ধীরে ধীরে কুণাল বেরিয়ে গেলো। লতাদের বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে সে যখন ভেতরে ঢুকলো তখন ড্রইংরুমে অর্গানের সামনে বসে গান গাইছে লতা। লতার পক্ষে এখন গান গাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। বিয়ের খবরটা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে লতাদের বাড়ী। কিছুদিন পূর্বে লতার সঙ্গেও ভালোবাসার অভিনয় কুণাল না করে গেছে এমন নয়। বিয়ের আশা নিয়ে লতা মেতেও উঠেছিলো খুবই, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই তাতে বাধ সেধে সরে পড়েছিলো কুণাল। তাই অপ্রত্যাশিত সুখবরে লতার মনে নব-বসন্তের ছোঁয়াচ লাগারই কথা। মনের সুরের সঙ্গে মিলিয়েই একটি আধুনিক গান সে গাইছে। গানের প্রথম কলিটি হলো ঃ

আমি হালকা হাওয়ায় যাবো উড়ে উড়ে—
উতল পবন তুমি বওনা ধীরে!

চেহারাটি লতার সুন্দর, কিন্তু তার সবটুকুই তলিয়ে গেছে মেদ-বহুলতার তলায়। লতাকে শুধু মোটা বললেই সবটা যেন বলা হয় না। গানের কথার সঙ্গে তার কায়িক পরিধিটি লক্ষ্য করলে

হাসির উদ্রেক হওয়ারই কথা। কুণাল আলতো পায়ে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে সেই অসঙ্গতিটাই উপভোগ করছিলো। কিন্তু বেচারা লতা আর কি করতে পারে, তার দেহ যতো স্থূলই হোক মনটি তো পাতলা মেয়েদের চেয়ে কোনো অংশে কম পাতলা নয়। তাই সে তার মনের আনন্দে গেয়ে চলে—

রজনীগন্ধা হায় কেন দোলে
তার আঘাতে আমি যে পড়ি ঢলে—
ছুলো না, ছুলো না অমন ক'রে।

গলা ছেড়ে অন্তরায় টান দেয় সে—

আমার এ অঙ্গখানি
তুলে সে লবে জানি,
লবে সে, লবে সে আপন ক'রে।

পেছনে দাঁড়িয়ে কুণাল তার হাতের পেশী বার ছুই শক্ত করে। একটু নড়তে গিয়ে জুতোর শব্দ হলো কুণালের। লতা চমকে পেছনে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলো গান ফেলে। গানটা শেষ করতে অনুরোধ জানালো কুণাল, কিন্তু কে কার কথা শোনে! লতা এগিয়ে এসে সরল মনে অনেক অনুযোগ জানালো, কুণাল নিজে এসে প্রথমেই তাকে খবরটা দেয়নি বলে। তারপর মুখ ভার করে সরে গেল জানলার কাছে।

কুণাল তার পেছনে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে বললো, 'কি, রাগ করেছো, কথা বলবে না ?'

'দুদিন যাবৎ খালি খালি ফোন করছো',—লতার কণ্ঠে অভিমানের সুর। 'একবার আসতে পারো না বুঝি?'

'তুমি বুঝবে না লতা, যেই স্থির করলাম তোমায় বিয়ে করবো, তারপর থেকে আমার কি ভাবনা—কতবড় গুরুভার—' তাড়াতাড়ি সামলে নিলো কুণাল, 'আই মীন, গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিতে যাচ্ছি বুঝতেই পারো। তাই কি বিজ্‌নেস করবো, তা নিয়ে এই দুদিন কি যে ছুটোছুটি করতে হয়েছে—'

'ও, তারই জন্যে আসতে পারোনি—ফুঃ, তুমি করবে ব্যবসা—'

এগিয়ে গিয়ে লতা বসে পড়লো লম্বা কৌচটায়, কুণাল এসে বসলো তার পাশে।

'জানো, বীণা কণিকা ওরা সব বলে কি' মুখ ভার করে বলতে থাকে লতা, 'আমার বাবা এককাঁড়ি টাকা দেবেন বলেই নাকি তুমি আমাকে বিয়ে করছো। ওরা হাসে আর বলে,—নইলে কুণাল সেনের মতো ছেলে তোর মতো মুটকীকে আসছে বিয়ে করতে—তুমি নাকি আমাকে ভালোবাসতেই পারো না।'

'ঈর্ষা—ঈর্ষা, লতা—' একেবারে কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কুণাল। 'তোমাকে ভালোবাসতে পারবো না, পারবো ওদের মতো হাড়গিলেদের, না! শোনো লতা, আজ আমার বহুদিনের একটা গোপন সাধ তোমাকে খুলে বলছি—' পাশের শান্তি-নিকেতনী মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে পড়লো লতার মুখোমুখি।

'আমার জ্যেঠিমাকে দেখেছি সেই ছেলেবেলায়, তিনি ছিলেন ইয়া মোটা—' হাত দিয়ে পরিধিটা দেখিয়ে দেয়। 'মোড়ায় বসতেন তো বেরিয়ে থাকতো এদিকে এক ফুট, ওদিকে এক ফুট। সেদিন থেকেই মনে মনে শখ ছিলো, বিয়েই যদি করতে হয় তো ওই রকম। আমার বলতে বোঝাবে এই এ্যা—তো খানি।' আবার হাত দুটো সে ছড়িয়ে দেয়। 'বউ বলতে দাঁড়াবে এসে টিংটিং-এ একটি প্যাকাটি, যা হাতের মুঠোয় চেপে ধরা যায়, চ্ছোঃ—'

কুণালের কথা শুনে খিল খিল করে সরল হাসিতে এলিয়ে পড়লো লতা। ঠিক এমনি সময় ঘরের কোণে বেজে উঠলো ফোন। লতা এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলো।

'হ্যাল্লো—হ্যাঁ, ডবল টু নাইন সেভেন কথা বলছি—' কথা শুনতে শুনতে লতার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। 'ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।' বলে ফোন নাবিয়ে রেখে এগিয়ে আসে কুণালের কাছে। 'তুমি আবার মিলিদের বাড়ী যাচ্ছো! তোমাকে ফোনে ডাকছে—উঃ, কি রাগ, বলে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন। নিশ্চয়ই আমাদের বিয়ের খবর ও শুনেছে—না, ওর ফোন তোমাকে আমি ধরতে দেবো না।'

মিলির ফোন শুনে কুণালের মুখ শুকিয়ে যায়। কি জানি এরই মধ্যে আবার কি অঘটন ঘটে বসে আছে! তবু মনের ভাব গোপন করে বলে ওঠে কুণাল, 'আরে, না.না, তুমি যে কি বলো,

ওর নিজেরই যে বিয়ে হচ্ছে মন্টি বোসের সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যে। তারই ব্যবস্থাপত্র করতে গিয়ে কোথাও আটকে পড়েছে বোধ হয়—আচ্ছা দাঁড়াও দেখছি।' উঠে গিয়ে ফোন ধরলো কুণাল—'হ্যাল্লো, কুণাল কথা বলছি।'

উল্টো দিক থেকে রীতিমতো খেঁকিয়ে ওঠে মিলি, 'তুমি কি আমার সর্বনাশ না-করে ছাড়বে না? তোমার ছেলেকে আজ চিল্‌ড্রেন্স হোম থেকে পৌঁছে দিয়ে গেছে আমার বাড়ী, একটানা এমন হল্লা করছিলো যে, তারা কিছুতেই রাখতে পারলো না—আচ্ছা, কোন আক্কেলে আমার ঠিকানাটা সেখানে দিয়ে এলে বলো তো—তোমার বাড়ীতে ফোন করে জানলাম তুমি এখানে—নিজে বেশ স্ফূর্তি করে বেড়াচ্ছো—'

খবর শুনে আকাশ ভেঙে পড়লো কুণালের মাথায়। লতা পেছনে দাঁড়িয়ে। ঘটনা সম্পর্কিত কোনো অভিব্যক্তি দেওয়াও সম্ভব নয়। খামোখা হি হি করে হেসে ওঠে কুণাল, যদিও হাসিটা তেমন জোর ধরে না। 'অ—তোমার বিয়ের মার্কেটিং, পছন্দের জন্যে আমাকে চাই, সে আর এমন একটা বড় কথা কি, আচ্ছা আমি এক্ষুনি আসছি, কি কাণ্ড—এ নিয়ে এমন জরুরী তলব!'

কুণালের কথার ধরন শুনে ওদিকে রাগে মিলির দাঁতে দাঁত চেপে আসে। 'ওঃ—হো-অট্ এ ক্রিমিন্যাল্—নিশ্চয়ই কাছে মুট্‌কীটা দাঁড়িয়ে আছে।'

মিলির রাগের পরিমাণটা বেশ উপলব্ধি করে কুণাল। তবু হা-হা করেই হেসে উঠতে হলো তাকে। 'আমি তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম—আচ্ছা এক্ষুনি আসছি।' ঝপ করে ফোনটা নামিয়ে রেখে তাকালো লতার দিকে। 'দেখো লতা, কি কাণ্ড! বিয়ে করবে ওরা, শাড়ী গয়না আসবাবপত্র পছন্দ করে দিতে হবে আমাকে, যত ঝামেলা—এতো করে বলছে, আসি একবার ঘুরে, কি বলো?'

কুণাল এভাবে অনুমতি চাইছে, মুহূর্তে লতার মন গর্বে আনন্দে গলে যায়। বেশ একটু শাসনের ভাব নিয়েই বলে, 'কিন্তু আজই শেষ, আর কোনোদিন যেতে পারবে না বলছি।' এবার পাকা গিন্নীর ভাব দেখা দিলো লতার মুখে। 'মিলিদের অবস্থা তো আমার জানা আছে, দেখো ওর ন্যাকামিতে গলে গিয়ে তুমি আবার এককাঁড়ি টাকা খরচ করে বোসো না।'

'না গো, না—' লতার চিবুক ধরে নেড়ে দিলো কুণাল। 'আমি অমন কাঁচা ছেলেটি নই।' বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলো সে।

মিলিদের সেই বসবার ঘরে টোম্যাটো বসে আছে একটা কৌচে, আর মিলি ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক।

'তুমি ভালো না—' চেঁচিয়ে উঠলো টোম্যাটো, 'বাবার কাছে যাবো।'

'ফের চেঁচাবে তো এক চড় কষে দেবো গালে।'

'না, মারবে না। আমি যাবো—ও—ও—' আরও চেঁচিয়ে উঠলো টোম্যাটো।

'উঃ, কি ক্ষুদে বিচ্ছু রে বাবা! আচ্ছা যাবি যাবি, জ্বালিয়ে খেলে!' হাতের ঘড়িটা একবার দেখে নিলো মিলি। 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে কুণাল না এলে আমিই তোকে রেখে আসবো ওদের বাড়ী।' অনেকটা আপন মনেই বলে, 'এঃ, আর মিনিট কুড়ির মধ্যেই মন্টির এসে পড়ার কথা, একটু আগে এসে পড়লে যে কি করবো—' একটু ভেবে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো টোম্যাটোর কাছে। যথাসম্ভব মিষ্টি করে বললো, 'দেখো খোকা, তোমার বাবা আসবার আগে কেউ যদি এসে পড়ে আর জিজ্ঞেস করে তুমি কোথায় থাকো, তবে বোলো পাশের বাড়ী, কেমন?'

চেঁচিয়ে উঠলো টোম্যাটো, 'না—বলবো না—' চকলেট মাখা হাত দিয়ে ঠেলে দিল মিলির ঝুঁকে-পড়া মুখ।

'বলবে—' ধমকের সুরে বলে ঝটকা আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিলো মিলি।

'বলবো না—'

'বলবে—বলবে—'

'না—'

একের পর এক উভয়ের কণ্ঠ চড়তে থাকে। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে মিলি স্তব্ধ হয়ে যায়—অদূরে দাঁড়িয়ে মন্টি। এগিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো মন্টি, 'গালে কি সব মেখে এই বাচ্চা ছেলের সঙ্গে গলার পাল্লা দিচ্ছ, ব্যাপার কি?'

চরম বিব্রত হয়েও আঁচল দিয়ে পুরো মুখটা মুছে নিলো মিলি। আমতা আমতা করে বললো, 'এঁ্যা—এ কিছু নয়—তুমি এসো, পাশের ঘরে বসবে চলো—'

'একটু আগে এসে পড়ে তোমায় ভারী বিব্রত করলাম দেখছি। পাশের ঘরে কেন—এ ছেলেটি কে?'

'বাবার কাছে যাবো—' আবার চেঁচিয়ে উঠলো টোম্যাটো।

'বাবার কাছে যাবে! কার ছেলে?' মিলির অস্বস্তি ও চঞ্চলতা নজরে পড়লো মন্টির। 'তুমিই বা অমন করছো কেন?' জিজ্ঞেস করে টোম্যাটোকে, 'খোকা, কোথায় থাকো তুমি, তোমার বাবার নাম কি?'

মিলি ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে টোম্যাটোকে কোনো

অছিলায় বাধা দিতে। কিন্তু দরকার হয় না, বলে ওঠে টোম্যাটো, 'বলবো না তোমাকে, বলবো না।—মা মা—'

'মা!' বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে মন্টি তাকালো মিলির দিকে। তারপর বিমূঢ়ের মতো বসে পড়লো একটা কৌচে। চরম সর্বনাশ ঘটে যাবার ভাব নিয়ে মিলিও বসে পড়ে।

'কে এই ছেলে?' মন্টির স্বর কঠোর।

'আমি চিনি না।'

'তোমাকে মা বলছে, তুমি চেনো না মানে?'

হঠাৎ উত্তেজনায় একপাশে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত বলে যায় মিলি, 'না না, আমি চিনি না—সেদিন সন্ধ্যায় একটা রাত আশ্রয় দেবার জন্যে কুণাল এসে জোর করে রেখে গিয়েছিল—এর বেশী আর আমি কিছু জানি না।' কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে ফেলে হাত দিয়ে কপালটা টিপে ধরলো মিলি।

'কুণাল—কুণাল আবার আসা-যাওয়া করছে এখানে!' টেনে টেনে কথা ক'টি বলে তাকালো সে টোম্যাটোর দিকে। 'তোমার বাবার নামটি কি বলো তো খোকা?'

'কুণাল সেন দি গ্রেট।'

'অ, দি গ্রেটের পুত্র তুমি—বাঃ, বেশ বেশ, বাবা—মা—' হা হা করে সশব্দে মন্টি হেসে ওঠে মিলির দিকে তাকিয়ে।

'কিছু না জেনে শুনে অমন হা হা করে হাসবে না বলছি—আগে আমার কাছে শোনো ঘটনাটি কি—'

'যা শুনছি, যা দেখছি, এর পর আর শোনাশুনির কি থাকতে পারে। কুণাল সম্পর্কে তোমার উইকনেস আজও আছে আমি জানতাম, কিন্তু তার ছেলে নিয়ে আমাকে—'

ক্ষিপ্তের মতো উঠে দাঁড়ালো মিলি। 'এর পর আর একটি কথাও উচ্চারণ করবে না বলছি। যে বিশ্বাস করে না, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি।'

'পুরোনো সম্পর্কটাই নতুন করে ঝালিয়ে নেবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে তাহলে—' তীব্র শ্লেষের ভাব নিয়ে বলে মন্টি।

'হয় নি, তবে এটাও জেনে যাও, হলে, ঠকেছি মনে করবো না।' ফুঁসে উঠলো মিলি।

'বেশ, তাই জেনে গেলাম।' বলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মন্টি, তারপর ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে।

'রাবিশ—রাবিশ—' ছটফট করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে মিলি। 'অল রট্—পিসী—পিসী—'

মিলির মেজাজ মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে তার পিসীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পাত্র আর কেউ নেই। তাই মেজাজ বিগড়োলেই মিলি প্রথম হাঁক ছাড়ে পিসীর উদ্দেশে। অবিশ্যি এ রাগ প্রকাশের মধ্যে পিসীর প্রতি অবহেলার ভাব কোথাও নেই, যা আছে সে হোলো স্নেহের দাবী। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকলো পিসী।

তাকে ঘটনার আগুপিছু কিছু না বলে গড়গড় করে বলে চললো মিলি, 'মন্টি এসে আমাকে সন্দেহ করে জঘন্য সব কথা

বলছিলো। ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি চুকিয়ে দিয়েছি। যে বিশ্বাস করে না, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভালো করিনি ?'

রাগের মাথায় মিলি কোনো প্রশ্ন করলে কি উত্তর দেবে পিসী ভেবে যেন থই পায় না। আবার দেরী করাও চলে না, তাই মোটামুটি একটা খুশী-করা জবাবই সে দিতে চেষ্টা করে।

'হ্যাঁ, তা এমন হলে ভালোই করেছিস।' বললো পিসী।

'কিছু না ভেবেই বলে বসলে ; ভালো করেছি! কেন, ভালো করেছি কেন ?'

'না, বলছিলাম—' আরও বিব্রত হয়ে উঠলো পিসী। একটু সামলে নিয়ে বললো, 'তোর এতো বুদ্ধি, তুই যা করেছিস নিশ্চয়ই ভালো বুঝেই করেছিস।'

'হুঁঃ, রাগের মাথায় ভালো বোঝবার মতো বুদ্ধি যেন মানুষের ঠিক থাকে ! তুমিও যেমন—'

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পায় কুণাল এসে ঢুকছে ঘরে।

'ঐ যে এসেছেন দি গ্রেট—' অপ্রকৃতিস্থের মতো চেঁচিয়ে উঠলো মিলি। 'যাও, এক্ষুনি নিয়ে যাও তোমার এই ছেলেকে, ছেলে তো নয় ক্ষুদে বিচ্ছু—বললাম—বলিস, পাশের বাড়ীতেই থাকিস—যাক—যাক—' পূর্ব মুহূর্তের ঘটনাকে যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইলো মিলি। 'যাও যাও, নিয়ে যাও—'

'এ্যাঁ—হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে যাচ্ছি—' মিলির ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে ভীত

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে কুণাল। ‘আয় আয়, টোম্যাটো চলে আয় শিগগির—’

‘এখন আর শিগগির করে কি হবে—’ হতাশা মেশানো শ্লেষের সুর মিলির কণ্ঠে। ‘সব রকমে আমার মুখ হাসালে, কেলেঙ্কারির আর বাকি রইলো কি !’

এখানে টোম্যাটোর অবাঞ্ছিত উপস্থিতির বাইরে আর কি ঘটেছে কুণালের জানা নেই। জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পায় না। বার দুই দ্বিধার সঙ্গে এদিক ওদিক তাকিয়ে অবশেষে টোম্যাটোর হাত ধরে সে এগিয়ে যায় বাইরের দিকে।

কুণাল ও টোম্যাটো চলে যাচ্ছে—মুহূর্তে মিলির উত্তেজনা ও চঞ্চলতা যেন থেমে যায়। কয়েক পা এগিয়ে এসে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তাকায় সেদিকে। বলে ওঠে, ‘তড়বড় করে নিয়ে তো চললে, এর পর কোথায় রাখবে শুনি—’

ঘুরে দাঁড়ালো কুণাল। ‘দেখি কি করা যায়—’ চিন্তিত ম্লান মুখে জবাব দিলো সে।

‘হ্যাঁ হ্যাঁ—যাও, তাই দেখোগো—আমার কি—যা খুশী তাই করোগে যাও—’ বলে মুখ ফিরিয়ে সরে গেল মিলি।

টোম্যাটোকে নিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো কুণাল।

গাড়ীতে গম্ভীর হয়ে পাশাপাশি বসে কুণাল আর টোম্যাটো। উদ্দেশ্যহীনভাবে এ-রাস্তা ও-রাস্তা গাড়ী চালিয়ে চলেছে কুণাল।

মাথায় তার সমাধান-হীন সমস্যা। এ ছেলেকে নিয়ে এখন কোথায় যায় সে ! এমন একটা অদ্ভুত অভাবনীয় দুর্ভাগ্য এসে কারোর উপর পড়তে পারে, এ যে কখনও তার কল্পনায়ও আসেনি। বহু মেয়ের ওপর অনেক অবিচার করেছে সে, তবে কি তারই পুঞ্জীভূত অভিশাপ এমন একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে এসে পড়লো তার অদৃষ্টে ! কথাটা মনে হতেই অস্বস্তিতে একবার নড়েচড়ে বসলো কুণাল। টোম্যাটোর দিকে তাকায়— শান্ত চুপচাপ বসে আছে পাশে। কে এই ছেলে—কেন তাকে এতখানি আপনার করে আঁকড়ে ধরলো, কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। টোম্যাটোকে প্রশ্ন করেও আর লাভ নেই। অনেক চেষ্টা করে সে দেখেছে, প্রথম দিন যা শুনেছে তারই পুনরাবৃত্তি করে চলে সে—টোম্যাটোর পূর্ব জীবনের কোনো তথ্যই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

বেড়ে ওঠে বেলা। প্রায় একটা নাগাদ কুণাল গাড়ী দাঁড় করালো চৌরঙ্গীর একটা প্রথম শ্রেণীর রেস্টুরেণ্টের সামনে।

'তোকে নিয়ে এখন যাই কোথায়—' অনেকটা আপন মনে বললো কুণাল। 'আচ্ছা চল, কিছু খেয়ে তো নেওয়া যাক।'

কুণাল নাবলো গাড়ী থেকে।

'না, আমি খাবো না।' টোম্যাটো তার সীটেই বসে রইলো।

'খাবি না, ক্ষিদে পায়নি—অ, ভয় পাচ্ছিস ফেলে পালাবো বলে—' একটু হাসলো কুণাল। 'পালাতে চাইলেও বা পারছি

কই !' সত্যিকার স্নেহের ভাব প্রকাশ পায় কুণালের কথায় ; বলে, 'বেশ, সঙ্গে সঙ্গেই থাকিস। আয় নেমে আয়, ক্ষিদেয় মুখ তো চুপসে গেছে।'

স্নেহের সত্যতা শিশুই বুঝি সবচেয়ে বেশী টের পায়— টোম্যাটো কিন্তু সহজেই এবার নেবে আসে গাড়ী থেকে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার সেই গাড়ীতে ঘোরার পালা। এখানে দাঁড়িয়ে ওখানে ঘুরে কাটলো সমস্তটা দিন। সারাটা দিন শহরে ও শহরাতিক্রান্ত সীমায় ঘুরে বেড়িয়ে গাড়ীর উপরেও পড়েছে পুরো ধূলির পলেস্তারা। দেখলে মনে হয় সুদূর মফস্বল শহর থেকে গাড়ীটা এইমাত্র এসে পৌঁছেছে কলকাতায়। আরোহীদ্বয়ের মুখেও একই ছাপ, রুক্ষ উষ্কখুষ্ক চুল, মুখে চোখে অপরিসীম ক্লান্তি।

সন্ধ্যায় আর একটা রেস্টুরেণ্টে চা ও কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে আরও খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো কুণাল। রাত প্রায় ন'টা নাগাদ স্ট্রাণ্ড রোড ধরে সে এসে দাঁড়ায় গঙ্গার ধারে, বুঝিবা মন ও মাথা একটু ঠাণ্ডা করে ভবিষ্যৎ পন্থা স্থির করতে।

টিন খুলে আর একটা সিগারেট ধরালো কুণাল।

কাছাকাছি গঙ্গার ধারে বসে কে যেন গান গাইছে। স্বাভাবিক ভালো-লাগা থেকেই বলে কুণাল, 'বাঃ, বেশ গাইছে তো !'

'গান শুনবো বাবা !'

আঙুল তুলে টেনে টেনে প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে বলে

কুণাল, 'তুই—আমাকে—বাবা বলবিনে—' রাগ-জ্বালা-হীন, ক্লান্তস্বর কুণালের।

'বলবো—' ক্ষীণকণ্ঠে আবদারের সুরে বললো টোম্যাটো।

'হুঁঃ, বেমক্কা কি বাবাটাই বনে গেলাম, আমাকেই বাবা-ডাক ছাড়াচ্ছে—আচ্ছা চল, গানই শোনা যাক, কিছুক্ষণ সময় তো কাটবে—'

গাড়ী থেকে নেবে দুজনে গিয়ে বসলো গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চিতে। অদূরে লোকটি বসে গান গাইছে। কুণাল সিগারেটের পর সিগারেট টেনে গানই উপভোগ করে, না, পরবর্তী কর্তব্যের ভাবনা ভাবে—বোঝা যায় না।

গান শেষ করে চলে গেলো লোকটি। কুণাল তার শেষ-হয়ে-আসা সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠতে যাবে, দেখে তার গায়ে এলিয়ে টোম্যাটো ঘুমিয়ে পড়েছে। মুহূর্তে মুক্তির আশায় চঞ্চল হয়ে ওঠে কুণালের মন। বার দুই এদিক ওদিক তাকিয়ে, দ্বিধা কাটিয়ে সাবধানে সে শুইয়ে দেয় টোম্যাটোকে বেঞ্চির ওপর। তারপর আর একবার আশপাশটা দেখে নিয়ে দ্রুত পায়ে গিয়ে উঠে বসে গাড়ীতে। স্টিয়ারিং ধরে কি যেন একটু ভাবে, স্টার্টও নেয়, কিন্তু আবার তা বন্ধ করে নেবে আসে গাড়ী থেকে।

কুণালকে দেখা যায় আবার টোম্যাটোর কাছে এগিয়ে যেতে। সেখানে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো সে—তারপর আর একবার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে দ্রুত পকেট

থেকে পার্‌স্‌টা বার করে গুঁজে দিলো টোম্যাটোর পকেটে। আর তাকালো না, ছুটে এসে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

বাড়ী ফিরে সেই একই পোশাকে কুণাল বসে রইলো তার শোবার ঘরের ইজি-চেয়ারে। আর কোনো কিছু করবার মতোই সামর্থ্য বা মনের ইচ্ছে তার ছিলো না। রাত্রের খাওয়াটাও সে এড়িয়ে গেলো, মার কাছে মিথ্যে বলে।

একটু চোখ লেগে এসেছিলো কুণালের, দেওয়াল ঘড়িটার ঢং ঢং আওয়াজে উঠে বসলো সে। বারোটা বাজলো। জামা-কাপড় পাল্টে শুয়ে পড়বার উদ্দেশ্যেই উঠে দাঁড়ালো কুণাল। কিন্তু শোওয়া তার হলো কই! ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কেবলই তার মনে হতে থাকে, ছেলেটাকে এভাবে ফেলে এসে সে ভালো করেনি। সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে, টাকা-শুদ্ধ পার্‌স্‌টা রেখে আসা—কোনো বদলোক বা গুণ্ডার হাতে পড়ে কি ঘটবে কে জানে!

ভাবতে ভাবতে সেই একই অবস্থায় কুণাল আবার এসে বসে পড়লো তার চেয়ারে। তার মনে নতুন করে এ প্রশ্নটা বড় হয়ে ওঠে—কার ছেলে, কোথায় থাকতো, কেনই বা তাকে এমন আত্মীয়ের মতো আঁকড়ে ধরলো?—ভাবতে ভাবতে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়লো কুণাল।

অন্ধকার তখনও কাটেনি। গঙ্গায় প্রাতঃস্নানার্থীদের আগমন সুরু হতে এখনও বেশ কিছুটা দেরী আছে। রাতের শেষটা সবার মাপেই সমান নয় নিশ্চয়ই, তাই খুব স্বাভাবিক না হলেও এই আবছা অন্ধকারে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখা যায় গঙ্গার ধারে এগিয়ে আসতে, পেছনে ভৃত্যের হাতে ধুতি ও তোয়ালে। হয়তো স্নানের পূর্বে ক্ষীয়মাণ রাত্রির আলোয় গঙ্গার শান্ত শোভাটি একটু উপভোগ করে নিতেই, বসবার আসনটি লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছিলেন তিনি। কাছাকাছি এসে অবাক হয়ে গেলেন—সেখানে একা বসে আছে ছোট্ট একটি ছেলে। সামনে এসে দেখেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে। ভদ্রলোক চারদিকে তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে না পেয়ে বলে উঠলেন, 'কার ছেলে গো, একা একা বসে এখানে কাঁদছে! তোমার সঙ্গে কেউ নেই, খোকা?'

ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে ঘাড় নেড়ে জানালো,—না।

'না—!' ভদ্রলোকের বিস্ময় চরমে উঠলো এবার, 'তোমার বাবার নাম কি, কোথায় থাকো, তোমাদের বাড়ীর নম্বর জানো?' ব্যস্ত হয়ে পর পর প্রশ্ন করলেন তিনি।

আরও জোরে কেঁদে উঠে এবারও ছেলেটি জানালো,—না।

'কি মুশকিল—' মহা চিন্তিত হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক।

'কার ছেলে, কেমন করে এখানে এলো—তোমার হাতে ওটা কি ?' হঠাৎ নজরে পড়ে ছেলেটির কোলের দিকে, সেখানে কি যেন একটা সে ধরে আ[illegible] তুলে দেখেন একটা মনিব্যাগ। খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বার করলেন কয়েকখানা দশটাকার নোট। 'এ যে অনেকগুলো টাকা—এই বা তোমার কাছে এলো কি করে—' কেমন একটা হদিস পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাগের এ-খোপ সে-খোপে তিনি আঙুল চালিয়ে দেন। বেরিয়ে আসে একখানা ছাপানো কার্ড। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন ভদ্রলোক। কার্ডের ওপর চোখ রেখে বলেন, 'যাক, পাওয়া গেছে। কুণাল সেন, সেভেনটি-টু বালিগঞ্জ প্লেস—তা তুমি এখানে এসে পড়লে কি করে! থাক, সে জানা যাবে পরে। ওদিকে তো নিশ্চয়ই তোমার জন্যে হুলুস্থুল চলছে।' ভৃত্যকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এই, শিগগির একে নিয়ে গাড়ীতে আয়।' বলে দ্রুত এগিয়ে গেলেন গাড়ীর দিকে।

হঠাৎ হর্নের গোটা দুই কর্কশ আওয়াজে কুণালের অস্বস্তি-জড়িত নিদ্রা ছুটে গেলো। চোখ মেলেই দেখে, সেই চেয়ারেই সে বসে আছে। ঘড়ির দিকে তাকায়—সাড়ে চারটে বাজে। আবার হর্নের শব্দ—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কুণাল। এসময় তাদের বাড়ীর সামনে ঘন ঘন হর্ন বাজাচ্ছে কে—কার গাড়ী—তবে কি টোম্যাটোকে নিয়েই কিছু ঘটলো

আবার ! এ-কথা মনে আসতেই ছুটে সে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

সামনের বাগানে পড়েই দেখতে পেলো, গেটের সামনে দাঁড়ানো একখানা গাড়ী। [illegible]লে বেরিয়ে আসতেই গাড়ীর বাইরে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের পাশ থেকে ছুটে এসে যে তাকে জড়িয়ে ধরলো, সে হলো শ্রীমান টোম্যাটো।

ভদ্রলোকটিও এগিয়ে এলেন কুণালের কাছে। 'কি করে ওখানে গেল মশাই ? আমি শেষ রাতে উঠে গঙ্গাস্নানে যাই, তাই না—'

হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করলো কুণাল। 'চুপ, আর কথা না বলে গাড়ীতে উঠে পড়ুন।' চাপা গলায় বললো কুণাল।

'বা বে মশাই—' রেগে উঠলেন ভদ্রলোক। 'বেশ ভদ্রলোক তো আপনি ! হারানো ছেলে ফিরিয়ে দিলাম, আর উপকার করতে এসে কিনা—'

'মহা উপকার করেছেন ! ধন্যবাদ, এখন যেতে পারেন।'

'আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি—'

'আঃ, চেঁচাবেন না !' কুণালের গলায় চাপা ধমক। গোপনে বলার ভঙ্গীতে ঝুঁকে পড়লো সে। 'আপনার ভালোর জন্যই বলছি মশাই—এর ভেতর অনেক গোলমাল রয়েছে, খামোখা জড়িয়ে পড়ে থানা-পুলিস করবেন শেষে—'

'থানা-পুলিস !' শঙ্কিত হলেন ভদ্রলোক। 'না মশাই, আমি

ওসবের মধ্যে নেই, দরকার নেই আমার উপকার করার—' বলতে বলতে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন। গাড়ী বেরিয়ে গেলো।

টোম্যাটোকে গঙ্গার ধারে ছেড়ে দিয়ে, বিপদ এড়িয়ে কুণাল যখন বাড়ী ফিরলো, কিন্তু উপলব্ধি করেছিলো সে, সমস্যা মিটলো বটে; কিন্তু স্বস্তি সে পাচ্ছে না। দুদিনের অনুষঙ্গে, অজানতে ছেলেটার প্রতি যে মমত্ববোধটুকু জেগেছে—সেটাই বড় হয়ে উঠেছিলো তখন। তাই নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় গিয়ে শুতে পর্যন্ত পারেনি। বসে বসে আধ ঘুমেই সারারাত কাটিয়েছে। যার জন্যে এতো ভাবনা, তাকে কাছে পেয়ে কিন্তু কুণালের মেজাজ আবার তিক্ত হয়ে উঠলো।

'আমার হাত থাকতে তুমি কি আর গুণ্ডার হাতে পড়বে—' দাঁতে দাঁত চেপে বলে কুণাল। খামোখা ভেবে ভেবে রাত জেগেছি, এখন পা টিপে-টিপে আমার সঙ্গে চলে এসো তো বাপধন, টুঁ শব্দটি কোরো না।'

টোম্যাটোর হাত ধরে পায়ের শব্দ বাঁচিয়ে কুণাল এগিয়ে চললো বাড়ীর ভেতর। প্রথমেই সে তার ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালো, দরোয়ানটা তার কর্তব্যবিরুদ্ধ কর্মে অচেতন থাকায়। বাতি না জ্বালিয়েই সে ভেতরের বারান্দা ধরে এগিয়ে চলে। হর্নের আওয়াজে মা বাবা উঠে পড়েননি, এই যা রক্ষে। সুসাবধানে সবরকম শব্দ বাঁচিয়ে টোম্যাটোকে নিয়ে সে গিয়ে ঢুকলো তার শোবার ঘরে।

রাত শেষ হয়ে এসেছে, যা হোক একটু ঘুমিয়ে তো নেওয়া যাক। অনভ্যস্ত হাতে টোম্যাটোর জুতো খুলে রেখে, একটা বালিশ পাশে ঠেলে দিয়ে বলে, 'শুয়ে পড় এখন।'

বাধ্য ছেলেটির মতো শু[illegible]লো টোম্যাটো। কুণালও শুয়ে পড়ে, কাল সকালে উঠে বাবা-মাকে কি বলা যায় ভেবে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভাবনা বেশীদূর গড়ায় না, কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত কুণাল ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ভৃত্য শয্যা-চা নিয়ে ঘরে ঢুকে দাদাবাবুর পাশে একটি ছোট ছেলে শুয়ে আছে দেখে অবাক হলো। দুজনেই ঘুমোচ্ছে। বার দুই আস্তে আস্তে ডাকলো ভৃত্য দাদাবাবুকে। অন্যান্য দিন এ ডাকেই সাড়া দেয় কুণাল, তাই আজ ঘুমের গভীরতা দেখে আর ডাকতে সাহস পেলো না। চা নিয়ে ফিরে গেলো সে।

বারান্দায় দেখা কুণালের মার সঙ্গে। তিনি বড়কর্তার দুধের গেলাস হাতে যাচ্ছিলেন ড্রইংরুমের দিকে, ভৃত্য ডাকলো, 'মা।'

ফিরে দাঁড়ালেন কুণালের মা।

'দাদাবাবু এখনও এমন ঘুমোচ্ছেন তাই আর ডাকলাম না।'

'বেশ তো, আর একটু পরে দিস।'

বলে পা বাড়াতে যারেন, ভৃত্য বললো, 'দাদাবাবুর পাশে কে একটি ছোট ছেলে শুয়ে আছে।'

'ছোট ছেলে, কুণালের পাশে—কই দেখি তো—'

মা গিয়ে ঢুকলেন কুণালের ঘরে। তাই তো—ঝুঁকে পড়ে

মুখখানা দেখলেন, তার চেনার মধ্যে কেউ বলে মনে হলো না। অঘোরে দুজন ঘুমোচ্ছে, উঠুক, পরে জানা যাবে কে।

কুণালের মা চলে এলেন [illegible]র ঘরে। শিবনাথের কৌচের পাশে একটা টিপয় টেনে [illegible] গ্লাসটা বসিয়ে দিয়ে সাধারণ ভাবেই বলেন, 'কুণালের পাশে একটি ছোট ছেলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।'

চোখ থেকে কাগজ না সরিয়ে, হাত বাড়িয়ে দুধের গ্লাসটা টেনে নিলেন শিবনাথ। 'ছোটো ছেলে—কে?'

ঘুম থেকে না উঠলে কি করে জানবো।' বললেন কুণালের মা। 'কোনো বন্ধু-বান্ধবের হবে—ছোট ছেলেপুলে সইতেই পারতো না, বিয়ের মতলব মাথায় আসতেই মতিগতি ফিরলো নাকি! লতাদের বাড়ীর কেউ নয় তো?' একটু মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

'কে জানে—হ্যাঁ, ভালো কথা, অম্বিকাবাবু—মানে লতার বাবা একটু পরেই আসবেন কথাবার্তা কইতে, তাঁর আদর আপ্যায়নের—'

'সে তোমার ভাবতে হবে না, ব্যবস্থা সব করাই আছে।'

ওদিকে কুণাল তখন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। পাশে টোম্যাটোর ওপর চোখ পড়তেই গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা একে একে মনে পড়ে। 'টোম্যাটো, টোম্যাটো—ওঠ—' আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে জাগালো সে টোম্যাটোকে।

উঠে বসে বার দুই চোখ কচলে তাকালো টোম্যাটো, নতুন পরিবেশের বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে বেশ একটু সময় লাগলো তার।

'চল, ওঠ।' টোম্যাটো[illegible] নিয়ে খাট থেকে নেমে এলো। খোলা দরজাটা নজ[illegible]ড়তেই সেটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে টোম্যাটোকে নিয়ে ঢুকলো বাথরুমে। সব বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো সে। মুখে চোখে জল দিয়ে একটু পরেই প্যাণ্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে এলো টোম্যাটো।

'শোন টোম্যাটো, চুপটি করে এখানে বসে থাক, আমি স্নান সেরে আসছি।' জামা-কাপড় নিয়ে কুণাল গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে।

একা ঘরে টোম্যাটো কয়েক মুহূর্ত চুপ করেই বসে রইলো। কিন্তু নানা অপরিচিত বস্তু ওর কৌতূহলী দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। উঠে পড়লো টোম্যাটো। এটা-সেটা দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলো দরজার কাছে। প্রথমটা ভরসা পেলো না, তাই দ্বিধার সঙ্গে দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো বাইরেটা। এ দ্বিধা কাটতেও তার সময় লাগলো না, একটু পরেই দরজা খুলে সে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। সেখানেও দেখবার কতো কি আছে বৈকি—এখানে সেখানে থাম মতো পাথরের ওপর বসানো পাথরের মূর্তি, তা ছাড়া কত বড় বড় ছবি ঝুলানো রয়েছে দেওয়ালে—বিস্ময়ে চোখ বড় করে দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো টোম্যাটো। পাশেই একটা খোলা দরজা, কৌতূহল নিয়ে উঁকি দিলো সে।

ভেতর থেকে কুণালের মা বলে উঠলেন, 'এই তো ছেলেটি—এসো তো খোকা, এসো—এসো।'

এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেলো টোম্যাটো।

'এসো—' বলে হাত বা[illegible] টেনে নিলেন কাছে। জিজ্ঞেস করলেন সস্নেহে, 'কোথায় থাকো তুমি—কি নাম তোমার খোকা?'

'টোম্যাটো।'

কাগজ সরিয়ে শিবনাথও একবার দেখেন ছেলেটিকে।

'বাঃ, মজার নাম তো তোমার—' হাসলেন কুণালের মা। 'তোমার বাবার নাম কি?'

'কুণাল সেন দি গ্রেট।'

একসঙ্গে আঁতকে উঠলেন শিবনাথ ও কুণালের মা। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকালেন এ ওঁর দিকে।

'কুণাল সেন!' ঝুঁকে পড়লেন শিবনাথ। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করে নিতে প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তুমি যার সঙ্গে শুয়ে ছিলে সে তোমার কে হয়?'

'বাবা।'

হাতের কাগজ খসে পড়লো শিবনাথের।

'বাবা!' কুণালের মারও সন্দেহ কাটে না।

'তোমার বাবা?'

'হুঁ।'

কৌচ ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন শিবনাথ। তাঁর সব রাগটা গিয়ে পড়লো স্ত্রীর ওপর। 'নাও, ছেলের বজ্জাতির জন্যে মুঠো মুঠো টাকা যোগানোর ফল সামলাও—কোথায় কি কেলেঙ্কারি করে বসে আছে তার কি ঠিক আছে কিছু—' উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন শিবনাথ।

কুণালের মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন টোম্যাটোর মুখের দিকে।

ক্রুদ্ধ শিবনাথ বলতে থাকেন, 'বিয়ে করেছে কি করেনি, এ ছেলে এ্যাদ্দিন কোথায় কার কাছে ছিলো—ছি ছি! কি লজ্জা—'

চিবুক ধরে টোম্যাটোর মুখখানা তুলে বলে উঠলেন কুণালের মা, 'দেখো, মুখের এই নিচের দিকটা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব মিল—কুণাল আমার চেহারাই পেয়েছে কিনা—'

'হ্যাঁ, এখন বসে তুমি চেহারার মিল খোঁজো, আমার মাথায় জ্বলছে আগুন—উঃ, কি রাস্কেল—' সক্রোধে এসব কথা বলতে থাকেন বটে, আবার এগিয়ে এসে ঝুঁকেও পড়েন টোম্যাটোর মুখের কাছে। খেঁকিয়ে ওঠেন, 'হুঁঃ, বুদ্ধিও নেই চোখও নেই—চিবুক আর চোখ দুটো তো একেবারে আমার পেয়েছে।'

কুণালের মা আরও কাছে টেনে নিয়ে নজর করে দেখেন। 'তোমার না হাতি—'

কথা আর এগুতে পারে না, ঘরে এসে ঢোকেন অম্বিকাবাবু।

'আসুন আসুন, অম্বিকাবাবু—' দ্রুত মুখের ভাব পরিবর্তন করে অভ্যর্থনা জানালেন শিবনাথ। ব্যস্ত হয়ে টোম্যাটোকে বলেন, 'খোকা, তুমি একটু [illegible]রে যাও তো—'

'না না, থাকনা।' বসতে বসতে বললেন অম্বিকাবাবু। 'বাঃ, সুন্দর ছেলেটি তো! কার ছেলে?'

'পাশের বাড়ীর।' ঢোঁক গিলে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন কুণালের মা।

'এসো তো খোকা, এসো—' ডাকলেন অম্বিকাবাবু।

টোম্যাটো কাছে এগিয়ে গেলো। অস্বস্তিতে ছটফট করে ওঠেন কুণালের মা-বাবা। তাঁদের মধ্যে একবার অসহায় দৃষ্টি বিনিময় হয়।

'কি নাম তোমার?'

'টোম্যাটো।' অম্বিকাবাবুর প্রশ্নের জবাব দিলো টোম্যাটো।

একটু প্রাণখোলা ধরনের লোক অম্বিকাবাবু। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন নাম শুনে। 'অদ্ভুত নাম তো তোমার!' আদর করে পিঠে হাত বুলোন টোম্যাটোর। 'তোমার বাবার নামটি কি বলো তো?'

এবার রীতিমতো চঞ্চল হয়ে ওঠেন কুণালের মা-বাবা।

'কুণাল সেন দি গ্রেট।'

মুখের হাসি মিলিয়ে যায় অম্বিকাবাবুর; ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন

করেন, কুণাল সেন—কোন কুণাল সেন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন শিবনাথের দিকে।

এদিকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে কুণাল টোম্যাটোকে ঘরে না-দেখে ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হয় ড্রইংরুমের দরজায়।

'ঐ যে বাবা।' খুশী হয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো টোম্যাটো।

টোম্যাটোকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন অম্বিকা-বাবু। কুণালের দিক থেকে ঘৃণার সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকালেন শিবনাথের দিকে। 'আপনার ছেলেকে দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে দিচ্ছেন, এটা আমাকে জানানো উচিত ছিলো। আপনার মতো মানী লোকের এ তঞ্চকতা শোভা পায় না। আচ্ছা আসি, নমস্কার।'

অন্ধকার মুখ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন অম্বিকাবাবু ঘর থেকে।

প্রথমেই ফেটে পড়লেন শিবনাথ, 'কি! বাপকে অপমান করবার বাসনা পূর্ণ হয়েছে—স্কাউণ্ড্রেল—' স্ত্রীকে বলেন, 'আমি আগেই বলেছি তোমাকে, এ ছেলে বংশের নাম ডোবাবে।'

কুণালের কাছে এগিয়ে আসেন মা, 'যাক, যা হবার হয়েছে, এখন খুলে বল তো সব ঘটনা।'

'কি আর বলবো, ও আমার ছেলে নয়।'

'ফের মিথ্যে কথা—' প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন শিবনাথ।

বেরও, বেরও বাড়ী থেকে—' হাত দিয়ে সদর দেখিয়ে এগিয়ে আসেন তিনি।

'আমার কথাটাই শুনুন—' বলে কুণাল।

'আচ্ছা, ওকি বলতে চায় শোনোই না।' কুণালের মা থামান শিবনাথকে।

'একঝুড়ি মিথ্যে শুনে লাভ কি ?'

কুণালের মা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, 'তোরই যদি ছেলে না হবে, তো তোকে বাবা-বাবা বলছে কেন ?'

'তাই তো বলতে চাচ্ছি—বলতে দিচ্ছ কই।' বিষয়টাকে হালকা করতে একটু হাসলো কুণাল। 'ও আমার এক বন্ধুর ছেলে। কিছুদিন হলো মাথা একটু খারাপ হয়ে গেছে, থেকে থেকে স্মরণশক্তি কেমন যেন গুলিয়ে যায়, কিছুদিনের জন্যে কতক কথা হয়তো একেবারে মনেই করতে পারে না—বাবা-মাকে তো ভুলে যায়ই, এমনকি পছন্দ মতো কাউকে বাবা-কাকা ডেকে বসে, আর তাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। আবার স্মরণশক্তি ফিরে পেলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

কথাগুলি যেন বিশ্বাসযোগ্যই মনে হলো শিবনাথের কাছে। বললেন, 'বেশ, তাই যদি হয় তো সেই বন্ধুকে এনে প্রমাণ করো।'

'করবোই তো—কাল ও আমার সঙ্গে আসার সময়ই ওর বাবা-মা বলেছে আসবে একদিন ।'

'একদিন নয়, আজই নিয়ে এসো।' জোর দিয়ে বলেন শিবনাথ।

'আজ সন্ধ্যায়—ওদের বাড়ীতে কি একটা ফাংশন আছে—' আমতা আমতা করে বলে কুণাল। 'আচ্ছা, কাল কি পরশু নিয়ে আসবো।'

'বেশ তাই এনো।' ভারী গলায় বলে পেছনে হাত রেখে আবার পায়চারি স্থুরু করেন শিবনাথ।

কুণাল ফিরে গেলো তার ঘরে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কুণালের মা। শিবনাথ এগিয়ে আসেন টোম্যাটোর সামনে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটু লক্ষ্য করে বলেন, 'দেখে, কথা শুনে মাথা খারাপ বলে তো মনে হয় না—কি জানি হবে—' হাত উল্টে দুর্বোধ্যতার ভাব প্রকাশ করে তিনি গিয়ে বসে পড়েন কৌচে।

চার-পাঁচ দিনের ঘটনা মিলির জীবনের অনেক কিছুই যেন ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে। মনটা তার সত্যিই ভালো নেই। দুদিন যাবৎ কাজেও বেরোচ্ছে না সে। সেদিন থেকে মন্টিও আসা বন্ধ করেছে। ঘটনার আকস্মিকতা, আর দশের কাছে এ নিয়ে জবাবদিহি করার অস্বস্তি ছাড়া তার মনে এ বিচ্ছেদ সম্পর্কে কোনও ক্ষোভ বা বেদনাবোধ আছে, এমনও নয়।

কুণালকে কিন্তু সে ইতিমধ্যে খুবই আশা করেছিলো একবার। অন্ততঃ টোম্যাটোর কি ব্যবস্থা করলো, সে খবরটা তাকে একবার দেওয়ার দায়িত্ব কুণালের আছে বৈকি। দুটো রাতের জন্যে হলেও, সে তার ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে তাকে হাঙ্গামাও পোয়াতে হয়েছে অনেক। সমস্ত ব্যাপারটার বিরুদ্ধে মন তার নতুন করে তিক্ত হয়ে ওঠে—তবু তারই মধ্যে থেকে থেকে কানে বেজে ওঠে অপরিচিত ছেলেটার সেই ডাক।

মনের এ অবস্থায় সকালের দিকে মিলি লম্বা কৌচটায় কাত হয়ে এলিয়ে আছে দৈনিক কাগজটা হাতে নিয়ে। পাশের টিপয়ে পড়ে আছে ভুক্তাবশিষ্ট-সমেত চায়ের ট্রে। অদূরে বসে

উল বুনছে পিসী। এমন সময় পিয়নের হাঁক শোনা গেল, একটু পরেই বেয়ারা এসে মিলির হাতে দিলো একখানি ইনসিওরড্ খাম। খামের ঠিকানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উঠে বসলো মিলি, কুঞ্চিত তার ভ্রূ। চিল্‌ড্রেন্স হোম থেকে পাঠানো কুণালের চিঠি। 'মস্ত চাকরি হলো আমার, বসে বসে ঠিকানা কেটে এখন বাবুর চিঠি পাঠাও—' ব্লাউসে আঁটা কলমটা টেনে নিয়ে ঠিকানা পালটে ফেরত দিলো খামটা।

ভৃত্য চলে গেলে পিসীকে লক্ষ্য করে বললো মিলি, 'দেখছো পিসী, কুণালটা কি আন্দাজ স্বার্থপর, আর একবার এসে দেখা পর্যন্ত করলে না! ছেলেটার কি ব্যবস্থা করল, আমাকে অন্ততঃ, একটা খবর দেওয়া উচিৎ ছিলো, তাই না?'

'তাই বৈকি—তুই এ নিয়ে কম হাঙ্গামা পোয়ালি না, আর ও কাজটুকু হাসিল করেই সরে পড়লো।'

'তা পড়ুক গে।' জোর করে অবহেলার ভাব দেখিয়ে কাগজ হাতে উঠে পায়চারি করতে লাগলো মিলি। 'আচ্ছা পিসী, কুণালটা অত্যন্ত বাজে, একেবারে অপদার্থ, না? তোমার কি মনে হয়?' মিলি এসে দাঁড়ালো পিসীর সামনে।

পিসীর বড় রাগ কুণালের ওপর। চালিয়াৎ ছেলেটাকে কোনোদিনই দেখতে পারে না সে। মিলির কথা এবং মুখের ভাবে ভরসা পেয়ে বলে উঠলো সে, 'আমি তো আগাগোড়াই তাই বলি। তুই-ই না ওকে দেখলেই গলে জল হয়ে যাস।'

'আমার মনে হয় কি জানো, ছেলেটাকে হয়তো ও রাস্তায় ছেড়ে পালিয়েছে।'

'তা ছাড়া আবার কি—' আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলো পিসী। মুখ বাঁকিয়ে বললো, 'তাই-ই তো করেছে।'

'তাই করেছে তুমি জানলে কি করে?' মুখের ভাব পালটে গেল মিলির, রুষ্ট কঠোর কণ্ঠ তার। 'কক্ষনো করেনি।'

'কেন তুই নিজেও তো বললি।' ভীত হলো পিসী।

'আমি বলেছি—হয়তো করেছে, তুমি বললে—তাই-ই তো করেছে, যেন নিজের চোখে দেখে এসেছো।'

'তা না-হয় বাপু একটু বেশীই বলেছি, তা বলে তুই অতো চটছিস কেন?'

'ধ্যাৎ তোর, চটলাম কোথায় আমি—' হাতের কাগজটা আছড়ে ফেললো মিলি কার্পেটে, 'খামোখা কথা বোলো না।'

'নারে বাপু তুই চটিসনি—' মিলিকে শান্ত করতে বললো পিসী।

'তবে—তাই বলো—' বলে মিলি আবার গিয়ে কৌচটায় ঝপ করে বসে পড়লো।

এদিকে কুণাল তখন তার বন্ধু মিঃ ঘোষের বাড়ীতে ঘোষ আর তার স্ত্রী মীরার মহড়া নিচ্ছে—বাবার কাছে গিয়ে, কেমন করে কি তারা বলবে, তারই বক্তব্য আর অভিনয়ের। সোজা,

সরল লোক ঘোষ। প্রথমটা কুণালের এই প্রস্তাব সে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজি তাকে হতে হলো। কুণালের কোনো অনুরোধকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, চাকরি থেকে সুরু করে আরও নানা সমস্যায় কুণালের সাহায্য তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। তা ছাড়া মীরার স্বভাবটা একটু চঞ্চল, বেশ কিছুটা ছেলেমানুষিও তার মধ্যে আছে ; উৎসাহের সঙ্গেই সে সায় দিলো কুণালের প্রস্তাবে। তাদের কাছে ব্যাপারটা নিছক মজার ছাড়া আর কি। ঠিক মতো উৎরে দিতে পারলে, কুণালবাবুকে ধরে একদিন সারা-দিনের একটা প্রোগ্রাম করা যাবে।

'শোন ঘোষ—' কুণাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল ঘোষকে, বাধা দিয়ে হেসে বলে উঠলো মীরা, 'যা বলবার আমাকে বলুন, ওর ওপর কোনোও ভরসা রাখবেন না আপনি। কিছু বলতে গেলে, দেবে আপনাকে ডুবিয়ে। অভিনয় করবো আমি দেখবেন একেবারে পারফেক্ট—আপনি শিখিয়ে দিচ্ছেন, আপনারই হয়তো সত্যি মনে হবে। এখন বলুন, সাকসেস্‌ফুল হলে কি খাওয়াচ্ছেন ?'

'খাওয়ানো তো তুচ্ছ কথা মীরা, জিজ্ঞেস করো কি প্রেজেন্ট দেবো—আচ্ছা সে পরে স্থির করা যাবে, এখন আমি চলি।' উঠে দাঁড়ালো কুণাল। বললো ঘোষকে, 'তবে এই কথা রইলো, কাল ঠিক এগারোটায় মীরাকে নিয়ে আসছিস ?'

'না-গিয়ে আর উপায় কি বল।' হাসলো ঘোষ।

মীরা কুণালের খুব কাছে এগিয়ে আসে। মুখে দুষ্টুমির হাসি। ফিসফিস করে বলে, 'আমরা তো আপনার দলের হয়ে গেলাম, এখন বলুন না 'মা'টিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ?'

হতাশার ভাব নিয়ে হাত দুটো উল্টে দিলো কুণাল। 'এসব কথা শুনলে আর আমার রাগও হয় না— যাক, সত্য যেটা একদিন জানতে পারবেই। আচ্ছা, বাই বাই—'

হাত নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, দ্রুতপায় সিঁড়ি বেয়ে নেবে গেলো কুণাল।

পরের দিন কুণালকে দেখা যায় ঘোষ-দম্পতির অপেক্ষায় বেশ একটু আগে থেকেই বসে আছে ড্রইংরুমে। অদূরে টোম্যাটো কুণালের মার কিনে-দেওয়া কাঠের ঘোড়ায় চেপে হট্ হট্ করছে, আর মাঝে মাঝে জীবটার স্থাণুত্বের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে জানাচ্ছে প্রতিবাদ।

'আঃ, আবার হল্লা করছিস।' মৃদু ধমক দিলো কুণাল। 'বললাম যে, লোক আসবে—এ ঘর থেকে যা এখন।'

'যেতে বলছি দেখছো না—' নাকী সুরে বলে টোম্যাটো, 'ঘোড়াটা যাচ্ছে না যে !'

'ও কি আমি—যে তোমার কথায় ঘুরবে চলবে ?' মুখ ভেঙচে বললো কুণাল। 'দয়া করে কান ধরে টেনে নিয়ে যাও—যাও এখন বলছি।'

ঘোড়া নিয়ে সরে পড়লো টোম্যাটো।

হাতঘড়িটার দিকে আর একবার তাকালো কুণাল—প্রায় এগারোটা বাজে। আসবে তো ওরা? এতো জোর দিয়ে বাবা-মাকে বলে রেখেছে, না এলে যে আরও বেকুব বনবে সে। মীরার আগ্রহটা স্মরণ করে ওদের আসা সম্পর্কে নিজের মনকে ভরসা দেয় কুণাল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না কুণালকে। মিনিট দশেকের মধ্যে ঘোষ আর মীরা এসে উপস্থিত হলো। তাড়াতাড়ি তাদের সামনে উঠে গিয়ে গলা খাটো করে বললো কুণাল, 'এক্ষুনি ড্রপসিন উঠবে কিন্তু। আচ্ছা, বোস তোরা, বাবা-মাকে ডেকে আনছি।'

কুণাল চলে গেলো ভেতরে। বসেই, ঘোষের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো মীরা, 'দেখো, বেফাঁস কিছু বলে ফেলো না কিন্তু। সুরুটা তুমি করবে, তারপর আমি সব—' পায়ের শব্দ পেয়ে থামলো সে। যদিও নিজেই কথা বলছিলো, তবু স্বামীকে চুপ করার ইঙ্গিত করে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর হয়ে বসলো সে।

কুণাল ফিরে এলো মা ও বাবাকে নিয়ে। সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ঘোষ আর মীরা।

'আমার বন্ধু রমেন ঘোষ—মিসেস ঘোষ।' পরিচয় করিয়ে দিলো কুণাল।

'বোসো, বোসো তোমরা।' বললেন শিবনাথ। সবাই আসন গ্রহণ করার পর বার ছুই হাত কচলে প্রথমে ঘোষই স্থুরু করে, 'আমার ছেলেটা তো নিশ্চয়ই আপনাদের খুব বিরক্ত করছে, যা ছুষ্টু—'

'না, বিরক্ত আর কি, ছোট ছেলে—' মামুলী ভাবে জবাব দেন শিবনাথ।

'কতোদিন হলো এমন হয়েছে মা?' সখেদে কুণালের মা প্রশ্ন করলেন মীরাকে।

একটা বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো মীরা। 'মাস ছুই আগে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় বড় চোট পায়, তারপর থেকেই এরকম চলছে। কি যে ভাগ্য—' চোখে জল দেখা দেয় মীরার, ছুঃখের ভারে গলা যেন বন্ধ হয়ে আসে, 'একমাত্র ছেলে, ও যখন চিনতে পারে না—' একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নেওয়ার ভাব দেখিয়ে বলে, 'ওকে ডাকুন না একবার, দেখি যদি চিনতে পারে—'

উৎসাহের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো কুণাল—'ডাকলে কি ও আসবে, আমাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে, এখন ওর কাছে কেউ 'কেউ না'—আমিই সব।' আড় চোখে মীরার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বেরিয়ে গেলো সে।

'ডাক্তার দেখাওনি?' জিজ্ঞেস করেন কুণালের মা।

'কতো স্পেশালিস্ট দেখানো হলো—' মীরার চোখেমুখে

ঘোড়া নিয়ে সরে পড়লো টোম্যাটো।

হাতঘড়িটার দিকে আর একবার তাকালো কুণাল—প্রায় এগারোটা বাজে। আসবে তো ওরা? এতো জোর দিয়ে বাবা-মাকে বলে রেখেছে, না এলে যে আরও বেকুব বনবে সে। মীরার আগ্রহটা স্মরণ করে ওদের আসা সম্পর্কে নিজের মনকে ভরসা দেয় কুণাল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না কুণালকে। মিনিট দশেকের মধ্যে ঘোষ আর মীরা এসে উপস্থিত হলো। তাড়াতাড়ি তাদের সামনে উঠে গিয়ে গলা খাটো করে বললো কুণাল, 'এক্ষুনি ড্রপসিন উঠবে কিন্তু। আচ্ছা, বোস তোরা, বাবা-মাকে ডেকে আনছি।'

কুণাল চলে গেলো ভেতরে। বসেই, ঘোষের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো মীরা, 'দেখো, বেফাঁস কিছু বলে ফেলো না কিন্তু। সুরুটা তুমি করবে, তারপর আমি সব—' পায়ের শব্দ পেয়ে থামলো সে। যদিও নিজেই কথা বলছিলো, তবু স্বামীকে চুপ করার ইঙ্গিত করে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর হয়ে বসলো সে।

কুণাল ফিরে এলো মা ও বাবাকে নিয়ে। সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ঘোষ আর মীরা।

'আমার বন্ধু রমেন ঘোষ—মিসেস ঘোষ।' পরিচয় করিয়ে দিলো কুণাল।

'বোসো, বোসো তোমরা।' বললেন শিবনাথ। সবাই আসন গ্রহণ করার পর বার দুই হাত কচলে প্রথমে ঘোষই সুরু করে, 'আমার ছেলেটা তো নিশ্চয়ই আপনাদের খুব বিরক্ত করছে, যা দুষ্টু—'

'না, বিরক্ত আর কি, ছোট ছেলে—' মামুলী ভাবে জবাব দেন শিবনাথ।

'কতোদিন হলো এমন হয়েছে মা ?' সখেদে কুণালের মা প্রশ্ন করলেন মীরাকে।

একটা বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো মীরা। 'মাস দুই আগে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় বড় চোট পায়, তারপর থেকেই এরকম চলছে। কি যে ভাগ্য—' চোখে জল দেখা দেয় মীরার, দুঃখের ভারে গলা যেন বন্ধ হয়ে আসে, 'একমাত্র ছেলে, ও যখন চিনতে পারে না—' একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নেওয়ার ভাব দেখিয়ে বলে, 'ওকে ডাকুন না একবার, দেখি যদি চিনতে পারে—'

উৎসাহের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো কুণাল—'ডাকলে কি ও আসবে, আমাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে, এখন ওর কাছে কেউ 'কেউ না'—আমিই সব।' আড় চোখে মীরার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বেরিয়ে গেলো সে।

'ডাক্তার দেখাওনি ?' জিজ্ঞেস করেন কুণালের মা।

'কতো স্পেশালিস্ট দেখানো হলো—' মীরার চোখেমুখে

হতাশা। 'কেউ তো কিছু করতে পারছে না। কত যত্নে রাখি, তবু কখন যে ওর স্মরণশক্তি বিগড়ে যায় বুঝতে পারি না—' আবার দীর্ঘশ্বাস। 'এমনিতে আর কোনো পাগলামি নেই কিন্তু।'

কুণাল টোম্যাটোকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই মীরা ব্যস্ত হয়ে উঠে যায় টোম্যাটোর কাছে। হাঁটু ভেঙে বসে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'টোম্যাটো, আমাকে চিনতে পারিস? আয়, কাছে আয়।'

সত্যিকারের না-চেনা দৃষ্টি নিয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে একটু সঙ্কুচিত হয়ে সরে যায় টোম্যাটো।

'এই দেখুন, একেবারেই চিনতে পারছে না।' হতাশার সঙ্গে সবার দিকে তাকিয়ে কথা ক'টি বলে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে মীরা।

কুণালের মা এগিয়ে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেন। হাত ধরে তুলে এনে বসান নিজের পাশের আসনটিতে।

শিবনাথও সান্ত্বনা দেন, 'অতো ভেবো না মা, ছোট ছেলে, এখন থেকে ভালো করে চিকিৎসা চালালে সেরে যাবে নিশ্চয়ই।'

দুঃখের হাওয়ায় থমথমে হয়ে উঠলো ঘর। কুণালের মনে খুশী ধরে না। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে সে। যাক, বাবা-মা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। মীরা দেখতে পায় এমনি একটা পাশে দাঁড়িয়ে, গোপনে এমনভাবে হাতের ওপর সে হাত ঠোকে, যেন বলছে, 'বাঃ বাঃ, ওয়েল্ ডান্ মীরা'!'

এমন সময় ভৃত্য এসে ঢুকলো একখানা ইনসিওরড্ খাম হাতে। দরজার দিকটাতেই বসা শিবনাথ। প্রথমেই হাত বাড়ালেন তিনি। 'কার চিঠি রে?'

'ইনসিওরের চিঠি, দাদাবাবুর।' হাতে তুলে দিতে দিতে বলে ভৃত্য।

'ইনসিওরড্ চিঠি দাদাবাবুর—' বলে একটু অবাক হয়েই তাকান খামটার ওপর।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এগিয়ে আসে কুণাল। কিন্তু ঠিকানায় চোখ বুলিয়েই শিবনাথের মুখ থমথমে, ভ্রূ কুঞ্চিত। হাতের ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলেন কুণালকে। খামের ওপরকার প্রেরকের নাম, প্রেরিত অর্থের সংখ্যা ও ঠিকানার ওপর দিয়ে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। তারপর পেছনের রসিদটা ঝটকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলেন কুণালের দিকে। 'এটা সই করে দিয়ে দাও।'

একটু দ্বিধা করে কুণাল, আমতা আমতা করে জানতে চায় কোত্থেকে এসেছে।

'আগে সইটা করে দাও।' গম্ভীর আদেশের সুর শিবনাথের।

রসিদটা নিয়ে কোণের টেবিলে রেখে সই করে দিয়ে দিলো কুণাল ভৃত্যের হাতে। সে কল্পনাও করতে পারে না, কোথা থেকে আসতে পারে সেই চিঠি। যেখান থেকেই আসুক, বাবার মুখে দেখেই বুঝতে পেরেছে এর মধ্যে গোলযোগ কিছু একটা

আছে। কুণাল তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দাঁড়ায় শিবনাথের কাছাকাছি। শিবনাথ তখন চিঠি পড়ছেন, তাঁর হাতের মুঠোয় কিছু টাকা। কুণাল অস্বস্তিতে ছটফট করতে থাকে। সে-মুহূর্তে ঘোষ আর মীরার অস্তিত্বও তার খেয়াল থাকে না।

ঘোষ আর মীরাও কিছু বুঝতে না-পারার মুখ নিয়ে তাকাতে থাকে এদিক ওদিক!

কুণালের মা কৌতূহল আর চাপতে পারেন না, উঠে এগিয়ে এলেন শিবনাথের কাছে। 'কে টাকা পাঠালো—কার চিঠি?'

'বলছি।' কঠোর শিবনাথের কণ্ঠ। চিঠি থেকে চোখ তুলে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, 'তোমার ছেলেকে লেখা, মিলি রায়ের ঠিকানায়। সেখান থেকে ঠিকানা বদলে পাঠিয়েছে।'

আবার কুণাল ঝুঁকে পড়তে চেষ্টা করে, হাত তুলে বারণ করেন তিনি। 'তোমার ছেলে একটি ছোট ছেলেকে চিল্‌ড্রেন্স হোম-এ ভর্তি করেছিলো, পিতার নাম কুণাল সেন, পুত্রের নাম টোম্যাটো সেন—'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় কুণাল—ভীত-সন্ত্রস্ত ঘোষ আর মীরা। কেউ তারা স্থির করে উঠতে পারে না, এখন কি করা যায়। তাদের কানের ওপর দিয়ে শিবনাথের কথাগুলো পার হয়ে যেতে থাকে, 'ছেলেকে রাখতে পারেনি বলে অগ্রিম টাকাটা ফেরত পাঠিয়েছে—'

আর মুহূর্ত দেরী করা চলে না। পলায়ন ছাড়া আর পথ কই—ফাঁক বুঝে হাত দিয়ে ইশারা করতে থাকে কুণাল ঘোষ আর মীরাকে উঠে পালাতে। ইশারাটা প্রথম চোখে পড়লো ঘোষের, সে উঠে মীরার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে ছুটে গিয়ে পড়লো বারান্দায়। মীরাও লাফিয়ে উঠে অনুসরণ করলো স্বামীর। বারান্দায় পৌঁছে দৌড়তে গিয়ে শাড়ীর কানায় হাইহিল বেধে পড়লো প্রায় হুমড়ি খেয়ে। 'ওগো, আমি পড়ে গেছি—' চাপা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো মীরা। ঘোষ তখন বারান্দা পেরিয়ে বাগানে পৌঁছে গেছে। ফিরে তাকিয়ে দেখলো মীরার অবস্থা। 'তুমি মেয়েছেলে বলে মারটা অন্ততঃ খাবে না—পরে এসো, আমি পালাই।' বলে আবার দৌড়তে লাগলো ঘোষ।

সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পেছন থেকে শিবনাথের হাঁক শোনে মীরা, 'ওকি, তোমরা যাচ্ছ কোথায়—চোরের সাক্ষী বাটপাড়—'

এদের পালাতে দেখে শিবনাথ কৌচ ছেড়ে উঠে এসেছিলেন প্রায় দরজা অবধি, ফিরে গিয়ে কঠোর 'দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কুণালের দিকে। শ্লেষ-মেশানো তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'এবার কি ফন্দি ফাঁদবে ভাবো।'

'এ ছেলে আমার নয়।' দৃঢ় কুণালের স্বর। 'লেক থেকে সঙ্গ নিয়েছে, তারপর বিপদে পড়ে আমি অনেক কিছুই করেছি।'

'এর পরও কথা বলছো তুমি—ড্যাম্‌নেবল্‌ লায়ার—' সজোরে ধমকে উঠলেন শিবনাথ।

মা এগিয়ে এলেন সমস্যার সমাধানে। 'খুলে বলই ন' খোকা, আমরা তো আর ওকে ফেলে দেবো না।'

'না—না না, এ ছেলে আমার নয়, এমনকি ওকে আমি চিনি না পর্যন্ত। কি করে যে এ সত্য প্রমাণ করি—' বিড়ম্বনায় মুষড়ে আসে কুণালের কণ্ঠ। 'দেখি, শেষ উপায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া।'

কুণালের আর কোনো কথায়ই আস্থা নেই শিবনাথের। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'বিজ্ঞাপন তোমাকে দিতে হবে না, আমিই দেবো। সাতদিনের মধ্যে কেউ যদি খোঁজ নিতে না আসে তো বুঝবো, ও আমারই নাতি; আমার সব সম্পত্তি ওকে দিয়ে যাবো, তুমি কানাকড়িটিও পাবে না।'

'দেখুন বিজ্ঞাপন দিয়ে, যদি কেউ না আসে তো ছেলেটার ভাগ্য ভালো।'

বলে বেরিয়ে গেলো কুণাল।

টোম্যাটো এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে, শিবনাথ বার দুই পায়চারি করে এগিয়ে গেলেন তার সামনে। হাতের চেটোয় মুখখানা তুলে ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন তার প্রতিটি আবয়বিক রেখা।

সেদিনই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিলেন শিবনাথ।

পরের দিন সকালে চার-পাঁচখানা দৈনিক সামনে ছড়িয়ে বসে আছেন শিবনাথ। স্ত্রী এসে দুধের গ্লাসটা পাশে রেখে দাঁড়াতেই বললেন, 'সব ক'টা কাগজেই বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে—সাতদিন চালিয়ে যাবো।' হাতের বাংলা কাগজটার পাতা উল্টে বার করলেন বিজ্ঞাপনটি। স্ত্রীকে শোনানোর উদ্দেশ্য নিয়েই পড়ে চললেন, 'টোম্যাটো নামে একটি ছোট ছেলের খোঁজখবর যদি কেউ নিতে চান, তবে আগামী বারো তারিখের মধ্যে তার যে-কোনো আত্মীয়-স্বজনকে সন্ধ্যা সাতটা হইতে আটটায় নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে।' পড়া শেষে চোখ তুললেন তিনি। 'হারানো-প্রাপ্তির কলমে নয়, স্পেশাল বিজ্ঞাপন, কেউ থেকে থাকলে চোখ পড়তে তার বাধ্য। —তোমার পুত্র দেখেছে ?'

'দেখেছে নিশ্চয়ই।'

'ওকে বলে দিও আজ থেকে সাতদিন সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত বাড়ী থাকতে। —জানি কেউ আসবে না।'

'বলবো। দেখি টোম্যাটো উঠলো কিনা, ছেলেটাকে ছাড়তে হবে ভাবতেও মনটা কেমন করে ওঠে।' বলে ভেতরে চলে গেলেন কুণালের মা।

তিনদিন পার হয়ে গেছে, খোঁজ নিতে আসেনি কেউ। সান্ধ্য আড্ডার জন্যে প্রস্তুত হয়ে শিবনাথের নির্দেশ অনুযায়ী

আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে কুণাল। তারপর নিরাশ হয়ে, বাবাকে একবার জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

দিব্য আছে টোম্যাটো। সারাদিন ছুটোছুটি আর আবদারে ব্যতিব্যস্ত করে রাখছে শিবনাথ আর কুণালের মাকে। ক'দিন ধরে টোম্যাটোর 'দাদু' আর 'ঠাক্‌মা' ডাকে মন যেন ভরে রয়েছে তাঁদের। এরই মধ্যে জামা কাপড় আর খেলনার আমদানিও কম হয়নি। যে-কোনো মুহূর্তে ছেলেটাকে ছেড়ে দেওয়ার আশঙ্কা মনের পেছনে থাকা সত্ত্বেও, কেমন করে যেন কুণালের মা-বাবার সারাদিনের সবটুকু মনোযোগ ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে পড়েছে ছেলেটার ওপর। একজন আদর করে খাওয়ান তো আর একজন নিয়ে বসেন পড়াতে, একজন পোশাক পরান তো আর একজন নিয়ে চলেন বেড়াতে। আবার একের বাড়াবাড়ি নিয়ে অপরের শাসনের প্রহসনটুকুও হয় উপভোগ্য। থেকে থেকেই একজন আর একজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান, নিশ্চিত না হয়ে মায়া বাড়ানোর ফল যে ভালো হবে না।

এমনি একটা অনুযোগের ব্যাপারই আবার ঘটলো সেদিন দুপুরে টোম্যাটোর খাওয়া নিয়ে। শোওয়ার ঘরে আরাম কেদারায় শিবনাথ বই পড়ছেন, ছুটে এসে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো টোম্যাটো। পেছনে ভাতের ডিস হাতে ঢুকলেন কুণালের মা, 'আচ্ছা, ভাত আর নাই খেলি, এই মাংসের টুকরোটা খেয়ে নে।' এগিয়ে এসে টুকরোটা বাড়িয়ে ধরেন তিনি।

'বলছি আর খাবো না—' তখনও কি একটা চিবুচ্ছে টোম্যাটো।

'উঃ, এই ছেলেকে খাওয়ানো যে কি—সারা বাড়ী পেছনে ছুটে বেড়াতে হয়! নে লক্ষ্মীটি, এটুকু খেয়ে নে।'

'থাক না, অতো করে খাওয়ানোর দরকার কি।' ভারী গলায় বললেন শিবনাথ। 'বলি মায়া বাড়িও না—কার ছেলে কোথায় চলে যাবে, তারপর কেঁদে ভাসাবে। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তো কথা শুনবে—'

শিবনাথের দিকে চোখ তুলে তাকান কুণালের মা। 'কাণ্ডজ্ঞান শুধু আমারই নেই, না, আচ্ছা দাঁড়াও আনছি—' বলে প্লেট হাতেই বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'ঠাক্‌মা খেতে বলছেন, খাচ্ছিস না কেন?'

'এ্যাত্‌তোগুলো খেয়ে পেট ভরে গেছে যে।' আরও গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে পরিমাণটা দেখিয়ে দিলো টোম্যাটো।

শিবনাথ বইএর পাতায় মনোযোগ দিতে যাবেন, ঘরে এসে ঢুকলেন কুণালের মা—একহাতে সেই প্লেট, আর এক হাতে রং-বে-রংএর কতকগুলো ছোটদের ছবির বই। 'টুকটুকে আর এক জোড়া জুতোও দেখলাম ডেস্কে—' বইগুলো এনে ছড়িয়ে দিলেন শিবনাথের কোলে। 'মায়া শুধু আমিই বাড়াচ্ছি, কাণ্ডজ্ঞানীর এ কাণ্ডগুলো কি?'

একটু সঙ্কুচিত হন শিবনাথ। আমতা আমতা করে বলেন,

'ও—ওতে আবার মায়া বাড়ানোর কি আছে। লেখাপড়া করতে তো হবেই, যেখানেই যাক সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'বাঁচতে তো হবেই, যেখানেই যাক খেয়ে-দেয়ে একটু ভালো শরীর নিয়েই যাক।' বলে মুখ টিপে হাসলেন কুণালের মা।

মুখের মতো জবাব পেয়ে বড়ই বিব্রত হলেন শিবনাথ, নেহাত অর্থহীনভাবেই বলে উঠলেন, 'বাঃ, কি কথাই বললেন—মাথামুণ্ডু নেই কথা একটা বললেই হলো—' কোলের বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবনাথ। 'মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে চলে আয় টোম্যাটো—পড়তে হবে।' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ছোট একটি নিশ্বাস ফেলেন কুণালের মা।

এমনি করেই কেটে গেলো ছ'টা দিন। সপ্তম দিনের সকালে কুণালের মা-বাবা দুজনেই বসে অছেন বসবার ঘরে, মাঝখানে ঘোড়ায় চড়ে হট হট করছে টোম্যাটো। খেলনার মধ্যে এই জন্তুটি তার সবচেয়ে আদরের বস্তু।

'ঠাকুমা—ঠাকুমা, সরে যাও সামনে থেকে, ঘোড়া আসছে—'

'ঠাকুমা-ঠাকুমা ডেকে মায়ায় আর জড়াসনে রে!'

'দাদু, একটু ঠেলে দাও না। কই দাও না—'

'দিচ্ছি রে দাদু, দিচ্ছি—' বাধ্য হয়েই কাগজ রেখে উঠে দাঁড়ান শিবনাথ। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'ছদিন তো পার হয়ে গেছে, আজকের সন্ধ্যাটা কাটলেই বাঁচা যায়।'

'কেউ আসবে ভাবতেও বুকটা কেমন করে ওঠে।' বলেন কুণালের মা।

'কই দাদু, ঠেলো না—' আবদারের সুরে চেঁচিয়ে ওঠে টোম্যাটো।

ঠেলছি রে, ঠেলছি—আজকের সন্ধ্যাটা যদি টিকে যাস তো কালই তোকে তাজা ঘোড়া কিনে দেবো, দেখিস তখন আর ঠেলতে হবে না।' বলে পুরু কার্পেটের ওপর দিয়ে টোম্যাটোর ঘোড়া ঠেলে নিয়ে বেড়ান তিনি।

আজ বেশ একটু দেরীতেই উঠেছে মিলি। ক'দিন ধরে ঘুম তার ভালো হচ্ছে না। নির্দেশ মতো বয় এসে চা আর খবরের কাগজটা রেখে গেলো। এখন প্রতিদিনই কাগজ খুলেই সে প্রথম লক্ষ্য করে শিবনাথের দেওয়া বিজ্ঞাপনটা আবার বেরিয়েছে কিনা। আজও কাগজ খুলেই দেখে সেই বিজ্ঞাপন রয়েছে তার জায়গায়। রাগে গা-টা রি-রি করে ওঠে মিলির। 'পিসী—পিসী—' চেঁচিয়ে ডাকে মিলি। রাগটা প্রকাশ করার জন্যে কাউকে চাই তার।

পাশের ঘর থেকে সাড়া দিয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো পিসী। মিলির এ ধরনের ডাককে বড়ই ভয় করে সে।

পিসী ঢুকতেই বলে উঠলো মিলি, 'এই দ্যাখো, আজও আবার বেরিয়েছে সেই বিজ্ঞাপন—' যেন এই বিজ্ঞাপন বেরোনোর অপরাধটা পিসীর। 'পর পর ছদিন ধরে বিজ্ঞাপন চলছে, কেউ খোঁজ নিতেও আসছে না। আসবে কোত্থেকে? ওর কি কেউ আছে? মা যে নেই, সে তো আমি প্রথম দিন কথা শুনেই বুঝেছি—তোমার কি মনে হয়?'

'কি জানি, কি করে জানবো।' নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে উত্তর দেয় পিসী।

'আহা জানবে কেন, মনে কি হয় তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'আমার কিছু মনে-টনে হয় না বাপু। কিসে কি বলে ব'সে আবার ধমক খাবো।'

পিসীর অবস্থা দেখে মায়া হলো মিলির। একটু হাসলো সে। অ, তাই—আমি বুঝি তোমাকে কেবল ধমকই দিই। বোসো পিসী, বোসো।' সস্নেহে হাত ধরে পিসীকে টেনে বসালো তার খাটে। 'যা বলছিলাম—কুণাল তো একটা যাচ্ছেতাই, ওর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বুড়োবুড়ির কাণ্ডটা দেখো! বুঝেছে ও কুণালেরই ছেলে, তবু তাড়াবার জন্যে কি-আন্দাজ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দেখেছো? তা পড়বে না—' তিক্ত শ্লেষের ভাব ফুটে ওঠে মিলির কথায়। 'ওই বড়লোক মুট্‌কীটার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে মোটা টাকা বাগানোর তালে রয়েছে যে! পরিবারের সবগুলো লোক বজ্জাত, তাই না?'

পিসী চুপ করেই থাকে। অভিব্যক্তি থেকে অভিমত কিছুই বোঝা যায় না পিসীর। অধৈর্যের মতো তার হাঁটুতে একটা ঠেলা দিয়ে বলে উঠলো মিলি, 'আঃ, একটা হ্যাঁ বলোই না—আমি চটবো না।'

'বললাম হ্যাঁ, তারপর—' পিসীও হেসে ফেললো এবার।

মুখের ভাবে পরিবর্তন দেখা দিলো মিলির। শান্ত, ভারী গলায় বললো সে, 'সত্যি পিসী, দোষ করেছে কুণাল—কিন্তু ওই শিশুটাতো কোনো অন্যায় করেনি—' একটু চুপ করে থেকে

বলে ওঠে, 'তুমি দেখে নিও, আর কয়েকটা দিন দেখে ছেলেটাকে ওরা পরিচয়হীন বলে নিশ্চয়ই কোনো অনাথ আশ্রমে গুঁজে দেবে।' ভাবতে গিয়েও বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে মিলি। 'এক এক সময় ইচ্ছে হয় কি জানো, ওদের বাড়ী গিয়ে আচ্ছা কড়া রকমের ছু-চার কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি বুড়োবুড়ীকে—'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মিলি, তারপর চঞ্চল পায় পায়চারি করতে থাকে ঘরের মধ্যে।

ছদিন ধরে প্রতি সন্ধ্যায় যেমন এসে বসেছেন শিবনাথ তাঁর ড্রইংরুমে, তেমনি আজও বসলেন। চোখের সামনে দেওয়ালে-ঝোলানো ঘড়ির বড় কাঁটাটা তাঁরই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো প্রতিটি মুহূর্ত পেছনে ঠেলে চলেছে এগিয়ে। দেখতে দেখতে শেষ আশঙ্কার প্রায় শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছলো। আটটা তখন বাজে—শেষপর্যন্ত ঢং ঢং করে বেজেও উঠলো। ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টাও বুঝিবা ছেলেদের মনে এতো আনন্দ যোগায় না, ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনিতে যে আনন্দ আজ পেলেন শিবনাথ। আস্থা ফিরে এলো তার নিজের বিচার-বুদ্ধিতে—তিনি তো প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন, এ ছেলে কুণালের না-হয়ে যায় না। ভেতরে নতুন

করে জোর পেলেন সত্য আবিষ্কারে জন্যে কুণালকে শক্ত হাতে চাপ দেবার।

অন্যান্য দিন বরং দু-চার মিনিট আগেই এসে হাজির হয় কুণাল তার বেরোনোর মুখে। প্রতিদিনই সে ভরসা রেখেছে, শেষপর্যন্ত আসবেই কেউ-না-কেউ। ছেলেটা তো আকাশ থেকে ছিটকে পড়েনি, এতোদিন হাওয়ায় ভেসেও বড় হয়নি—অন্ততঃ একজন কেউ ওর আছে নিশ্চয়ই। খবর পেয়ে যাকে ছুটে আসতে হবে। কিন্তু আজ আটটা বেজে যেতেই কুণালের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসে—বিষয়টার চরম দুর্বোধ্যতা তাকে স্থাণুর মতো বসিয়ে রাখে তার চেয়ারে।

শিবনাথ উঠতে যাবেন, এমন সময় ঢুকলো বেয়ারা। 'কে এক দিদিমণি দেখা করতে এসেছেন।'

চমকে উঠলেন শিবনাথ। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, কাগজে গড়া কাঠামোটাকেই এতোক্ষণ কংক্রীটের মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন তিনি।

যাক, যে-ই এসে থাক—দেখা তাঁকে করতেই হবে।

'নিয়ে আয়—' বললেন বেয়ারাকে। ভেতরের অস্থিরতায় বসা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে।

একটু পরেই ভেতরে এসে যে ঢুকলো, সে মিলি।

মিলিকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে বসলেন শিবনাথ। 'অ—মিলি। নতুন বেয়ারাটা তোমায় চেনে না; এসে বলছে, কে একজন

দিদিমণি—আমি ভাবলাম, বিজ্ঞাপন দেখে কেউ হয়তো টোম্যাটোর খোঁজ নিতেই এসেছে—বোসো বোসো—'। এমনিতেই মিলি ভালো মেজাজ নিয়ে আসেনি। তার উপর শিবনাথের শেষ কথায় সে বুঝতে পারলো না, টোম্যাটোর খোঁজ নিতে আসাটা শিবনাথের কাছে কতখানি মর্মান্তিক।

'আমি কিন্তু আপনার বিজ্ঞাপন দেখেই এসেছি।' একটা কৌচে বসে স্থির পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বললো মিলি।

'বিজ্ঞাপন দেখে!' বিস্ময়ের অবধি থাকে না শিবনাথের। 'কেন, এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?'

'আমি টোম্যাটোকে নিতে এসেছি, ও আমার—'

কথা শেষ করতে দিলেন না মিলিকে শিবনাথ। সক্রোধে খাড়া হয়ে উঠলেন তিনি আসন ছেড়ে। তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এই ছদিন ধরে কেউ আসেনি দেখে নিশ্চয়ই কুণাল কোনো নতুন মতলব এঁটে তোমাকে পাঠিয়েছে —শোনো মিলি, তোমরা সব একদলের, আমি বুঝেছি—তুমি বাড়ী যাও, আর তোমার কোনো কথা আমি শুনবো না—'

'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' ধীর, শান্ত-কণ্ঠে বললো মিলি। সত্যিই মিলি বুঝতে পারছিলো না শিবনাথের এতোখানি রাগের কারণ কি। কেননা সে যে ধরেই নিয়েছে, এরা টোম্যাটোকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই বাঁচে। তলিয়ে দেখবার জন্য বেশী ভাববার সময় নেই, মিলি

তাঁর সন্দেহের উত্তর দেয়, 'কুণালের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করে আমি এখানে আসিনি—আমি টোম্যাটোকে নিতে এসেছি—' একটু থামলো মিলি, 'কারণ টোম্যাটো আমার ছেলে।' বেশ একটু বেপরোয়া ভাবেই বলে ওঠে সে।

'হুঁঃ, ছেলে—' ক্রুদ্ধ ও বিব্রত শিবনাথ গুমরে উঠলেন। 'টোম্যাটো তোমার ছেলে—যা-তা একটা বলে বসলেই হলো! হাউ ভাল্‌গার—উঃ, তোমাদের মুখে কি কিছু আটকায় না! দাঁড়াও কাল সকালেই তোমার বাবাকে আমি টেলিগ্রাম করছি—ছেলে—ছেলে—' কৌচের পিঠে পিঠ ছেড়ে দিলেন তিনি। 'ছেলে—তাব প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ নিশ্চয়ই দেবো, টোম্যাটোকে ডাকুন—' মিলির কণ্ঠ তেমনি শান্ত।

'টোম্যাটো—টোম্যাটো', সক্রোধে হেঁকে উঠলেন শিবনাথ।

কাছাকাছিই খেলছিলো টোম্যাটো, শিবনাথের ডাক শুনে ছুটে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো সে।

'মা—মা এসেছে, দাদু—' একগাল হেসে দরজায় দাঁড়িয়ে বললো টোম্যাটো।

'কি বললি—মা!' আর কথা সরে না হতভম্ব শিবনাথের মুখে।

'হ্যাঁ দাদু, মা—ও-ই তো আমার মা হয়, তুমি জানো না বুঝি, বাবা জানে—' বলতে বলতে এগিয়ে আসে টোম্যাটো।

'এ্যাঁ—মা—' আবিষ্টের মতো কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবনাথ। দুহাত পেছনে রেখে খামোখাই এগিয়ে গেলেন দু-চার পা। বলে উঠলেন আপন মনে, 'তাই তো—চিল্‌ড্রেন্স-হোম-এর চিঠিটা তো ওর ঠিকানা থেকেই ঘুরে এসেছিলো—' স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন শিবনাথ।

পাথরের মতো সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে বললো মিলি, 'আশাকরি এর পর টোম্যাটোকে আমার সঙ্গে দিতে আপনার আর কোনো আপত্তি থাকতে পারে না—'

'পারে—' জমাট গলায় জবাব দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন শিবনাথ। ধীরে কয়েক পা এসে বললেন, 'তোমাকে ও যেমন 'মা' ডাকছে, তেমনি আর একজনকে 'বাবা' ডাকছে কিনা? তাই তার অধিকারটাও খতিয়ে দেখা দরকার।—বেয়ারা, বেয়ারা—'

ছুটে এলো বেয়ারা।

'খোকাবাবুকে ডাক, বল টোম্যাটোর খোঁজে লোক এসেছে।'

কর্তার মেজাজ বুঝে বেয়ারা ছুটে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দিলো কুণালের কাছে। দুশ্চিন্তায় বেঁকে যাওয়া কুণালের মেরুদণ্ড উৎসাহের ঝটকা ঝাঁকিতে যেন সোজা হয়ে উঠলো। টোম্যাটোর খোঁজ নিতে লোক এসেছে। এর চেয়ে বড় খবর আজ আর কি থাকতে পারে। পকেট থেকে পার্‌স্‌টা টেনে নিয়ে পুরো একটা দশটাকার নোটই সে বখশিশ হিসেবে বাড়িয়ে দিলো বেয়ারার হাতে। সময় থাকলে হয়তো বা ইঙ্গ-কেতায় দু-চার পাক নেচেও

নিতো সে বেয়ারাকে ধরে—কিন্তু তার আগে ওদিককার ঝামেলাটা মিটিয়ে আসা দরকার। দ্রুত পায়ে করিডোর পেরিয়ে সে ঢুকলো গিয়ে ড্রইংরুমে। ঢুকে কিন্তু মিলির অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে বেশ একটু থমকে যায় কুণাল। 'একি মিলি—তুমি এখানে! আমাকে যে বললো টোম্যাটোর খোঁজে লোক এসেছে—'

'ঠিকই শুনেছো।' শিবনাথ বলেন তাঁর ভারী গলায়। 'মিলি টোম্যাটোকেই নিতে এসেছে—'

আর এক নতুন দুর্বোধ্যতায় বিমূঢ় কুণাল। এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গিয়ে বসলো মিলির পাশের কৌচটাতে। 'তুমি এসেছো টোম্যাটোকে নিতে! ব্যাপারটা আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বেশী বুঝে তোমার দরকার নেই।' ধমকে উঠলেন শিবনাথ। 'মিলি টোম্যাটোর মা, তাই ওকে নিতে এসেছে।'

'মিলি বলছে—ও টোম্যাটোর মা!' একেবারে হাঁ হয়ে গেলো কুণাল।

'শুধু বলছেই না, আমি তার প্রমাণও পেয়েছি। সুরুতে আমি ভেবেছিলাম, এও তোমার আর এক সাজানো নষ্টামি—কিন্তু ঘরে ঢুকেই টোম্যাটো যেভাবে ওকে 'মা' বলে ডেকে উঠলো তারপর কোনো প্রশ্ন চলতে পারে না—'

এবার ব্যাপারটা যেন আংশিক বোধগম্য হয় কুণালের কাছে। মিলির অধিকারের কারণটা বুঝতে না পারলেও, 'মা' ডাকের

ইতিহাসটা জানা আছে তার। গালটা একবার চুলকে নিয়ে অনেকটা আপন-মনেই বলে, 'অ—টোম্যাটো, 'মা' ডেকেছে—' ধীরে উঠে দাঁড়ালো কুণাল। ঠোঁটের কোণে দেখা দিলো মৃদু হাসি। কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বললো শিবনাথকে, 'তা সত্য প্রমাণও যখন হয়ে গেছে, আর মিলিও ওকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, তখন আর আমাদের দিক থেকে আটকে রাখা ঠিক হবেনা তো—'

মিলি আর সামলাতে পারে না তার মেজাজ। ঝটকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে কুণালকে, 'উঃ, তুমি একটি মানুষ বটে! ভাবলে, ছেলেটাকে ঝেড়ে ফেলার মস্ত একটি সুযোগ যখন পাওয়াই গেলো তখন আর ছাড়ি কেন—না?'

'আরে, না না—' বিব্রত হয়ে মিলিকে শান্ত করতে বললো কুণাল, 'ঠিক তা নয়—আচ্ছা, পরে তোমার সঙ্গে দেখা করে—'

'না—' বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবনাথ। 'আর দেখা করার দরকার নেই—সব বুঝতে পেরেছি আমি। এ কেলেঙ্কারি আর একদিনও চলতে দেওয়া যেতে পারে না—যতসব হতভাগার দল! আমি কালই তোমাদের বিয়ে দিয়ে ছাড়বো, বলে রাখলাম—'

বিদ্যাসাগরী চটিতে চটাস-চটাস আওয়াজ তুলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন শিবনাথ।

'ফুঃ, বিয়ে! অসম্ভব—' মিলি ছিটকে কয়েক পা সরে যায় কুণালের কাছ থেকে।

'তা হতেই পারে না।' বলে সদম্ভে কুণালও উল্টো দিকে সরে যায় দু-চার পা। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে মিলিকে, 'তুমি—অসম্ভব বললে কেন ?'

'বললাম, কারণ তোমার মতো একটা লোককে বিয়ে করা উচিত নয় বলে।' ঝামটা মেরে মুখ ফেরালো মিলি।

হঠাৎ দুহাতে মিলির দুই ডানা ধরে তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললো কুণাল, 'লিস্ন্, লিস্ন্ মিলি—ভুলে যেও না তুমি কুণাল সেনের সঙ্গে কথা বলছো, যাকে পেলে আজও শহরের কত মেয়ে—'

কথা শেষ করতে না দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে মিলিও বলে ওঠে, 'তুমিও ভুলে যেও না, তুমি মিলি রায়ের সঙ্গে কথা বলছো—যার দরজায় এ-হেন কুণাল সেনও দিনের পর দিন ধর্না দিয়ে থেকেছে !'

'আমি তা ভুলিনি—' ধরা হাতে আস্তে ঝাঁকুনি দেয় কুণাল। মিলির একান্ত সান্নিধ্যে এসে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবেশে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। বিহ্বল চাপা কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে, 'সত্যিই আমি তা ভুলিনি মিলি—'

সে স্পর্শে ও চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মিলির মনে মনে একটা ওলট-পালট ঘটে যায়। মুহূর্তে তারও চোখে নেবে আসে শিশির-ভেজা শারদীয়া সকালের শান্ত কোমলতা।

মিলির সেই ভেজা শিউলির মতো চোখ-দুটিতে চোখ রেখে,

কুণাল তাকে আরও একটু সামনে টেনে আবার বলে ওঠে, 'ভুলেছি— ?'

বিবশ বিহ্বল মিলি ধীরে শুধু একটু মাথা নেড়ে তার কথার জবাব দেয়।

এক হাত মিলির কাঁধে, অপর হাতের লম্বা আঙুলগুলো কুণাল সস্নেহ গতিতে চালিয়ে দেয় মিলির চুলের ভেতর—হালকা মুঠোয় চেপে ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে টেনে দাবীর সুরে বলে, 'এর পর থেকে আর কখনো আমার ওপর মেজাজ তুমি করবে না—'

'দাদু, অ দাদু, শিগগির এসো—' এক কোণ থেকে চেঁচিয়ে ওঠে টোম্যাটো।

ক্ষুদে ডাকাতের এক ঢিলে আসমানী বেলেয়ারী ঝাড় যেন চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

চিৎকার শুনে ছুটে এলেন কুণালের বাবা ও মা।

বিস্ফারিত ভীত চোখ মেলে হাতের ভঙ্গী-সহ বলতে থাকে টোম্যাটো, 'বাবা না মার চুলের মুঠি ধরে এমনি করে টানছিলো—'

সলজ্জভাবে সরে দাঁড়িয়ে চোখ নিচু করে মিলি ও কুণাল।

একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হয় কুণালের মা-বাবার মধ্যে। শিবনাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তুই এদিকে চলে আয়, টোম্যাটো।' বলে দুজনেই সরে যান দরজা থেকে।

'বাবা আমি যাবো?' আবদারের সুরে প্রশ্ন করলো টোম্যাটো।

এগিয়ে এলো মিলি। তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললো, 'না রে, যেতে হবে না তোকে।'

কুণাল এসে মিলির কাঁধে হাত রেখে তাদের দুজনকেই টেনে নিলো আরও কাছে; বললো, 'কিন্তু ওর সত্যিকারের পরিচয়টা যে তোমার জানা দরকার মিলি—'

এক হাত তুলে মিলি চেপে ধরলো কুণালের মুখ। 'না, কোনো দরকার নেই। ওরই জন্যে আজ তোমাকে আমি পেলাম —ওর আজ একমাত্র পরিচয়, ও আমাদের ছেলে—'

সর্বনেশে কপালের চাষই চলেছে সর্বত্র—ভাগ্যের সঙ্গে যোগেনের পাল্টা পরিহাসটা জুতসই কাজে লেগে গেলো। না-ই বা যদি লাগতো, ছেলেটা অধিকাংশের একটুকরো অংশ হয়ে থাকতো মাত্র—এ কাহিনীর সূচনা হতো না, এই যা।